মাসুদ রানা

অপারেশন চিতা

কাজী আনোয়ার হোসেন

অপারেশন চিতা

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৯১

এক

টিপটিপ টিপটিপ বৃষ্টি পড়েই চলেছে গত তিনদিন ধরে। সেই সাথে এলোমেলো দমকা বাতাস। কাদাপানিতে প্যাচপেচে হয়ে আছে রাস্তাঘাট। রাত সবে সাড়ে আটটার কিছু বেশি হয়েছে, এরই মধ্যে বেশিরভাগ দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। যানবাহনও তেমন একটা চোখে পড়ছে না, পড়ে পড়ে ঝিমুচ্ছে রাজপথগুলো। এমন দিনে নিতান্ত দায় না ঠেকলে ঘর ছেড়ে বেরোয় না কেউ, মাঝে-মধ্যে এক-আধটা স্কুটার বা রিকশা চোখে পড়ছে, ফাঁকা রাস্তা পেয়ে তুফান বেগে ছুটে চলেছে গন্তব্যের দিকে।

ঢাকার ব্যস্ত জনজীবন প্রায় অচল করে ফেলেছে এই অবিরাম বৃষ্টি। অথচ এখনও মেঘের আনাগোনার কমতি নেই, সারাক্ষণ মুখ ভার করে আছে আকাশ।

কাকরাইল চৌরাস্তা পেরিয়ে এসে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সরকারী বাসভবনের সামনের আইল্যান্ড ঘুরে মগবাজারের দিকে ছুটল মাসুদ রানার মেটালিক গ্রীন প্রোটন সাগা। হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল বাঁয়ে রেখে আরেকটু এগিয়েই গতি কমাতে হলো ওকে, সামনে টকটকে লাল ট্রাফিক কন্ট্রোল সিগন্যাল জ্বলছে। মুচকে হাসল রানা, ট্রাফিকই নেই, তার আবার কন্ট্রোল সিগন্যাল। তবুও গাড়ি থামাল রানা। আইন আইনই।

গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়েছে দেখে বাঁ দিকের নিউজ পেপার স্ট্যান্ডের সামনে জবুথুবু হয়ে বসে থাকা বাচ্চা একটা মেয়ে ছুটে এল খোঁড়াতে খোঁড়াতে। ওর হাতে কয়েকটা বেলী ফুলের মালা, বিবর্ণ। জানালার পাশে এসে একটা মালা তুলে ধরল মেয়েটা, চাউনিতে নীরব আকুতি, মালা কিনতে বলছে।

ফুলের মালা কেনার মত মনের অবস্থা এ মুহূর্তে নেই মাসুদ রানার। বড্ডো ব্যস্ত ও এখন। তবু চুপচুপে ভেজা মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। শীতে কাঁপছে মেয়েটা হি হি করে, রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ঠোঁট দুটো। একটা কুকুরও নেই রাস্তায়, অথচ এই খোঁড়া বাচ্চাটা পড়ে আছে এত রাত অবধি—পেটের ধান্ধায়, যদি আর একটা মালা বেচা যায়।

হাত বাড়িয়ে মালাটা নিল রানা, দশ টাকার একটা নোট ধরিয়ে দিল মেয়েটার হাতে। কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে চাইল ওকে, কিন্তু পিছন থেকে হর্নের আওয়াজে থেমে গেল। সামনের আলো সবুজ হয়ে গেছে কখন যেন। আবার বেজে উঠল হর্ন। পিছনে তাকাল রানা, একটা পাজেরো

জীপ—একেবারে ওর পিছনের বাম্পারের সাথে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। উইন্ডশীল্ডে ছোট্ট করে রেড ক্রিসেন্ট আঁকা। ওকে পিছন ফিরে চাইতে দেখে দাঁত খিঁচিয়ে কি যেন বলল ওটার চালক, দ্রুত হাত নেড়ে এগুতে বলছে রানাকে।

গাড়ি ছাড়ল রানা। চট করে নজর বুলিয়ে নিল ড্যাশবোর্ডের ঘড়িটার ওপর। নটা বাজতে বিশ মিনিট বাকি। এই বিশ মিনিটের মধ্যে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছুতে হবে ওকে। রেঙ্গুন চলেছে মাসুদ রানা। ঠিক নটায় ছাড়বে বিমান। টুকটাক কিছু কাজ সারতে গিয়ে দেরি হয়ে গেছে বেরোতে।

দ্রুত মগবাজার রেল ক্রসিং পেরিয়ে এল ও। পিছনে আঠার মত লেগে আছে পাজেরো। একটু পর আবার হর্ন বাজাল ওটা, সেই সাথে ঘন ঘন হেডলাইট ডিপ করছে। মাইল মিটার ইন্ডিকেটরের দিকে তাকাল রানা, প্রায় একশো কিলোমিটার বেগে ছুটছে ওর গাড়ি, এই ভেজা রাস্তায় এরপরও সাইড চায়?

বোধহয় কোন জরুরী কলে চলেছে ডাক্তার, সিরিয়াস রোগী। গতি কমিয়ে রাস্তার কিনারা ঘেঁষে চলতে লাগল রানা। পরমুহূর্তে সাঁ করে ওকে পাশ কাটাল জীপ টানা হর্ন বাজিয়ে। ওটার পিছনের আসনে বসা কোট টাই পরা একজনকে দেখতে পেল রানা পলকের জন্যে, ওর দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল লোকটা। প্রতি সেকেন্ডে রানাকে পিছনে ফেলে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা, ভেজা রাস্তায় চড়চড় চড়চড় আওয়াজ তুলছে ওটার চওড়া টায়ার।

ঠিক মত কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটে গেল দুর্ঘটনাটা। রানার থেকে পঞ্চাশ গজমত এগিয়ে গেছে তখন পাজেরো, বাঁ দিকের বিজি প্রেস স্টাফ কোয়ার্টারের আড়াল থেকে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে বেরিয়ে এল একটা মোটর সাইকেল, বড় রাস্তায় উঠেই ডানে মোড় নিল। ব্যাপারটা চোখে পড়ামাত্র শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার, এক্সিলারেটর ছেড়ে ব্রেক পেডালে পা রাখল তাড়াতাড়ি।

দপ্ করে জ্বলে উঠল পাজেরোর ব্রেক লাইট, রাস্তার সাথে টায়ারের ঘর্ষণের তীক্ষ্ণ আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠল পুরো এলাকা। ব্রেক চাপার সাথে সাথে পিছলে গেল ওটার পিছনের চাকা, সাঁৎ করে ঘুরে গেল গাড়ি। উন্মত্তের মত হুইল ঘুরিয়ে সিধে করার চেষ্টা করল ওটাকে চালক, ঘন ঘন ব্রেক চেপে যথাসাধ্য চেষ্টা করল বাগে আনার, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। নিয়ন্ত্রণহীন ভারী গাড়িটা তখন পুরোপুরি যন্ত্রদানবে পরিণত হয়েছে, সামান্য একটু সোজা হয়েই আবার ঘুরে গেল, বিদ্যুৎগতিতে গোটা তিনেক ডিগবাজি খেল ওটা রাস্তার ওপর।

শেষ ডিগবাজিটা খেয়েই চার চাকা আকাশে তুলে দিয়ে রকেটের মত ছুটে চলল পাজেরো, ত্রিশ চল্লিশ ফুট রাস্তা পলকে পেরিয়ে গিয়ে বাঁ পাশের চওড়া ফুটপাথের কিনারায় দড়াম করে গুঁতো খেয়ে থেমে পড়ল। চাকাগুলো

ঘুরছে সাঁই সাঁই। ওদিকে বড় রাস্তায় উঠেই আজরাইলের মত হাঁ হাঁ করে ছুটে আসতে থাকা গাড়িটাকে দেখে জমে গিয়েছিল মোটর সাইকেল চালক, কোনরকমে হ্যান্ডেলটা বাঁয়ে ঘুরিয়ে নিতে পারল সে, একেবারে শেষ মুহূর্তে রাস্তা ছেড়ে কাদাপানির ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে ওপাশের পানি ভর্তি খাদে ঝপাং করে আছড়ে পড়ল গিয়ে মোটর সাইকেল নিয়ে।

পাজেরোর দেখাদেখি ব্রেক চেপেছিল রানাও। জান উড়ে গেছে সামনের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে। ভাগ্যিস অনেকটা পিছিয়ে ছিল ও তখন, আরেকটু কাছাকাছি থাকলে আর রেহাই ছিল না, সোজা ছুটে গিয়ে পাজেরোর পেছনে গুঁতো মারত প্রোটন সাগা।

বিধ্বস্ত জীপগাড়ির কাছে এসে লাফিয়ে নামল রানা গাড়ি থেকে। সংঘর্ষের প্রচণ্ড আওয়াজে ততক্ষণে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে অনেক লোক। হৈ হৈ করতে করতে ছুটে আসছে সবাই। ড্রাইভারের দরজার হাতল ধরে খানিক টানাটানি করল রানা গায়ের জোরে, কিন্তু কাজ হলো না,বডি তুবড়ে পুরোপুরি জ্যাম হয়ে গেছে দরজা, এক চুল নড়ল না ওটা।

ঝুঁকে পড়ে ভেতরে উঁকি দিল রানা। স্টিয়ারিং হুইলের রড চালককে আসনের সাথে গেঁথে ফেলেছে, তার বুক ও সীটের ব্যাক ভেদ করে পিছনদিক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। পিছনের আরোহীর ওপর এক পলক নজর বুলিয়েই সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা, এ-ও চলে গেছে সব সাহায্যের বাইরে। সীটের পাশে পড়ে আছে লোকটা উপুড় হয়ে, অথচ মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন চিত হয়ে শুয়ে আছে। দু'চোখ বিস্ফারিত। ঘাড় মটকে মৃত্যু হয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পিছিয়ে এল মাসুদ রানা। আশ্চর্য! ভাবল ও, দু'মিনিটও বোধহয় হয়নি ওকে ওভারটেক করেছে জীপগাড়িটা। অথচ এরই মধ্যে···। ওপাশের খাদের দিকে তাকাল রানা। কয়েকজন লোক নেমে পড়েছে ডোবায়, ভীত সন্ত্রস্ত মোটর সাইকেল চালককে তুলে আনছে। দুদিক থেকে তিন চারটে গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে এরমধ্যে ঘটনাস্থলে, হেডলাইটের আলোয় আলোকিত গোটা জায়গা।

লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচি ক্রমেই বাড়ছে। কেউ ছুটছে ডাক্তার ডাকতে, কেউ গাড়ির দরজা ভাঙার জন্যে শাবল আনতে, কেউ আবার গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচাচ্ছে, পুলিসে বা ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করতে বলছে অন্যকে।

ভিড় ঠেলে রাস্তায় উঠে এল রানা। ঘড়ির দিকে চোখ যেতে চঞ্চল হয়ে উঠল ভেতরে ভেতরে—আর মাত্র চোদ্দ মিনিট সময় আছে। তাড়াতাড়ি গাড়িতে এসে উঠল ও। ধীর গতিতে জটলাটার পাশ কাটিয়ে এপাশে এসে আইল্যান্ড ঘুরল, তারপর দাবিয়ে ধরল এক্সিলারেটর। এক মিনিটের মধ্যে মহাখালী আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল ছাড়িয়ে এল রানা। ঢাকা গেট পেরিয়ে ঘড়ি দেখল আবার—নয় মিনিট। উত্তেজনায় শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ওর।

মাঝেমধ্যে টঙ্গী-গাজীপুরের দিক থেকে এক আধটা বাস মিনিবাস আসছে, এছাড়া রাস্তা প্রায় ফাঁকাই। তুমুল গতিতে ছুটছে প্রোটন সাগা। কিন্তু

বেশিক্ষণ ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না গতি। নতুন এয়ারপোর্ট রোডটা বড্ডো বেশি বাঁকবহুল, বারবার গতি কমাতে হচ্ছে। তারপরও গাড়ি সামলানো দায়, চুল পরিমাণ এদিক ওদিক হলেই পিছলে যাচ্ছে চাকা, গা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চাইছে স্টিয়ারিং হুইলটা।

আড়াই মিনিট বাকি থাকতে বিমানবন্দরের লাউঞ্জের দোড়গোড়ায় উঠে এসে সজোরে ব্রেক কষল রানা। একহাতে ব্রীফকেস, অন্যহাতে পেটমোটা একটা ব্যাগ নিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। পিছন দিকে ফিরেও চাইল না ও, ডান পায়ের গোড়ালি দিয়ে লাথি মেরে দরজাটা বন্ধ করেই ছুটল ভেতরদিকে।

সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যালিটি সেরে প্লেনে উঠতে উঠতে নটা বেজে গেল। গ্যাঙওয়ের মাথায় সুন্দরী এক বিমানবালা দাঁড়িয়ে আছে 'বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স' লেখা ছাতা মাথায় দিয়ে। হন্তদন্ত যুবকের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল সে। 'ওয়েলকাম অ্যাবোর্ড, স্যার।'

'ধন্যবাদ।' তাকে পাশ কাটিয়ে আলোকিত বোয়িং ৭০৭-এর ভেতরে পা রাখল রানা। কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে প্রকাণ্ড বোয়িংটা। নারী পুরুষ মিলিয়ে বড় জোর ষাট-পঁয়ষট্টিজন যাত্রী হবে, অনুমান করল ও। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে তারা।

প্রথম সারিতে কোন যাত্রী নেই দেখে বাঁ দিকের জানালার পাশের সীটটায় বসতে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় ধূসর রঙের কমপ্লিট স্যুট পরা এক লোক নিঃশব্দ পায়ে এসে দাঁড়াল ওর সামনে। রানার চেয়ে ইঞ্চি তিনেক খাটো হবে লোকটা, কিন্তু পাশে প্রায় দ্বিগুণ। ক্রু কাট্ চুল, চৌকো চোয়াল। পরিষ্কার টের পাওয়া যায় একটু নড়লেই এর পোশাকের নিচে কিল্‌বিল্ করছে অসংখ্য পেশী। বডি বিল্ডার। একবার রানার মুখের দিকে, আরেকবার হাতের পেটমোটা ব্যাগটার দিকে চাইছে ঘন ঘন।

আড়চোখে বিমানের দরজা বন্ধ করার কাজে ব্যস্ত বিমানবালার দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলে উঠল লোকটা, 'আপনার দেখছি সময়জ্ঞান বলে কিছুই নেই, সাহেব। যাচ্ছেন কত গুরুত্বপূর্ণ মিশনে, অথচ ভাব দেখে মনে হচ্ছে···।'

'জ্বি?' বিস্মিত হয়ে লোকটার মুখের দিকে চাইল মাসুদ রানা, 'আমাকে বলছেন?'

'না!' দাঁত খিঁচাল ক্রু কাট্, 'বলছি আপনার পিছনের দরজাটাকে।' পরক্ষণেই মিষ্টি করে হাসল, কাজ সেরে এদিকেই আসছে বিমানবালা।

'আপনারা বসে পড়ুন, স্যার,' বলল মেয়েটি। 'এখুনি ফ্লাই করব আমরা।'

'হ্যাঁ, বসছি,' রানার দিকে ইশারা করে বলল লোকটা। 'আমার বন্ধু, বুঝলেন? ওর দেরি দেখে ভীষণ টেনশনে পড়ে গিয়েছিলাম।'

রানার চোখে চোখ রেখে মৃদু একটু হাসল বিমানবালা। 'সত্যি, স্যার, প্রায় মিস্ করছিলেন আপনি ফ্লাইটটা।'

'হ্যাঁ, গাড়িটা হঠাৎ পথের মাঝখানে গোলমাল শুরু করল···তাই···,' চট করে বডি বিল্ডারের ওপর নজর বুলিয়ে নিল রানা তার অজান্তে। কে এই লোক? একে কখনও দেখেছে বলে তো মনে পড়ে না।

রানার ব্যাগ দুটোর দিকে হাত বাড়াল মেয়েটা, 'আমাকে দিন, স্যার। হোল্ডে তুলে রাখি।'

'ধন্যবাদ। আমিই পারব।' ব্রীফকেসটা মাথার ওপরের ব্যাগেজ হোল্ডে ঢুকিয়ে দিল রানা। তারপর সীটে বসে পেটমোটা ব্যাগটা রাখল দুপায়ের ফাঁকে।

'ঠিক আছে, বিশ্রাম করুন,' রানার কাঁধ চাপড়ে দিল লোকটা। 'আপনার চার সারি পেছনে আছি আমরা। কোন দরকার হলে জানাবেন, কেমন?' আরেকবার ব্যাগটার ওপর নজর বুলিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। হেঁটে চলেছে বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে।

ঘাড় ঘুরিয়ে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে রানা। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে ভেতরে ভেতরে। ব্যাগটার দিকে ঘন ঘন চাইছিল কেন লোকটা বোঝা গেল না। আবার বলছে 'আমরা', তার মানে সঙ্গে আরও লোক আছে! খেয়াল হলো, প্রথমেই 'মিশন' কথাটা উল্লেখ করেছিল লোকটা। কিন্তু সে কি করে জানল ও মিশনে যাচ্ছে! এ কথা তো রানা ছাড়া আর কারও জানার প্রশ্নই আসে না।

চার সারি পিছনে আইলের ওপাশের আসনটায় বসে পড়ল গিয়ে বডি বিল্ডার। চোঁখ তুলে এদিকে তাকাবার আগেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে রানা। ভুরু কুঁচকে আছে চিন্তায়—কারা এরা?

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। এক এক করে চারটে শক্তিশালী এনজিনই স্টার্ট নিয়েছে ততক্ষণে বোয়িঙের, বাইরের প্রচণ্ড গর্জন ভেতরে বসে ভ্রমরের গুঞ্জনের মত লাগছে। ডানার নিচে ও লেজের কাছে খুব দ্রুত জ্বলছে নিভছে দুটো চোখ ধাঁধানো রঙিন আলো। বৃষ্টিস্নাত টারমাক আয়নার মত ফিরিয়ে দিচ্ছে সে আলো।

নড়ে উঠল প্রকাণ্ড বোয়িং। মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল রানওয়ের উত্তর প্রান্তের দিকে। প্রচুর সময় নিয়ে ট্যাক্সিইঙ শেষ করে ঘুরে দক্ষিণমুখো হয়ে দাঁড়াল স্থির হয়ে—দৌড় শুরু করার জন্যে প্রস্তুত। এয়ারপোর্ট টার্মিনালের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। বিরামহীন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সোডিয়াম লাইটগুলোও যেন ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠেছে। বাতাসে ধূলিকণা না থাকায় ওগুলোর উজ্জ্বলতা বেড়ে গেছে বহুগুণ, কটমট করে তাকিয়ে আছে বিমানটার দিকে।

হঠাৎ দৌড় শুরু করল বোয়িং, সেকেন্ডে সেকেন্ডে বাড়ছে গতি, সেই সাথে রানার পিঠ একটু একটু করে সেঁধিয়ে যাচ্ছে সীটের নরম স্পঞ্জের ভেতর। দশ সেকেন্ডের মাথায় রানওয়ে ত্যাগ করল বিমান, নাক উঁচু করে ক্রমেই উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে।

সীট বেল্ট খুলে নড়েচড়ে বসল রানা। ব্যাগটা তুলে নিল কোলের ওপর।

পিছনে মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেছে তখন আলো ঝলমল বর্ষণসিক্ত ঢাকা। গন্তব্যের পানে ছুটে চলল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর ঢাকা-রেঙ্গুন-ব্যাংকক-কুয়ালালামপুর-সিঙ্গাপুর-ঢাকা ফ্লাইট।

দুই

এগারো ঘণ্টা আগের কথা।

রানা এ জন্সির অফিসে একবার ঢুঁ মারবে বলে বাসা থেকে বেরিয়ে আসছিল মাসুদ রানা। তিন দিন পর দেশের বাইরে যাচ্ছে ও, এজেন্সির হাতে গুরুত্বপূর্ণ যে কেসগুলো আছে, তা নিয়ে গিলটি মিয়ার সাথে আলোচনা করা দরকার। এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল। পিছিয়ে এসে রিসিভার তুলল রানা, 'হ্যালো!'

'কি রে, শালা!' বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদের গলা ভেসে এল ওপ্রান্ত থেকে। 'হারাম খেয়ে খেয়ে গায়ে খুব তেল চর্বি জমে গেছে, না? বেলা দশটা পর্যন্ত নাকে তেল দিয়ে ঘুমানো হচ্ছে!'

'এই যাহ্, দিনটাই গেল নষ্ট হয়ে! কোথায় জরুরী ব্যবসায়িক কাজে বেরুচ্ছি, আর তুই কিনা ফোন তুলেই যা তা ভাষা শুরু করে দিলি সাত সকালে?'

'কি বললি, সাত সকাল? কথাটার মানে বুঝিস? সামনে পেলে অ্যায়সা এক লাথি মারতাম না তোর পোঁদে, শা-লা!'

'ফের গাল দিচ্ছিস?'

'গাল দিলাম কখন?' খুব অবাক হয়েছে যেন সোহেল, 'ওটা তো সম্বোধন। তুই যা, তাই বলে ডাকলাম।'

'ঠিক আছে। সময় নেই বলে এখনই এর একটা হেস্তনেস্ত করতে পারছি না। কিন্তু মনে রাখিস, এক মাঘমে শীত নেহি যাতা। পরে যখন তোকে হাতের কাছে পায়েগা, স্রেফ তুলোধুনা করেগা হাম। স্মরণ রাখনা।'

'নে থাম্!' ধমকে উঠল সোহেল, 'বাংলার হদ্দ করে এখন উর্দুর পিণ্ডি চটকানো হচ্ছে। সেই সোয়া নটা থেকে এখানে ওখানে ফোন করছি তোর খোঁজে, আর তুই কি না···।'

'বল, কেন খুঁজছিস।'

'কাঁচাপাকা ডেকেছে তোকে।'

'কেন?'

'জুতোপেটা করবে বলে।'

'আমার অপরাধ?'

'অপরাধ না? চাকরির নামে তো শালা ঠনঠন্, অফিসের ধারেকাছেও

আসিসনে। ওদিকে রানা এজেন্সি খুলে দুহাতে মানুষের টাকা পয়সা লুটছিস, যা সরকারী চাকরিনীতির পরিষ্কার বরখেলাপ। তাছাড়া…'

'কখন আসতে হবে,' মুচকে হাসল রানা।

'এক্ষুণি, এই মুহূর্তে।' ফোন ছেড়ে দিল সোহেল।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। সাততলার পুরু কার্পেট মোড়া করিডর পেরিয়ে মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের পি এ ইলোরার ছোট্ট রুমে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। কিছু একটা টাইপ করছিল ইলোরা, ওকে দেখে হাসল মিষ্টি করে। 'কেমন আছ?'

'এই মুহূর্তে বড্ডো টেনশনে, বুঝতেই পারছ,' চোখ মটকাল রানা।

'যাও ভেতরে,' বুড়ো আঙুল দিয়ে রাহাত খানের বন্ধ দরজা দেখাল ইলোরা। 'স্যার অপেক্ষায় আছেন।'

দুরু দুরু বুকে ঝকঝকে পালিশ করা দরজাটার সামনে এসে দাঁড়াল ও। বুকের মধ্যে ছলকে উঠল এক ঝলক রক্ত, শুকিয়ে উঠল মুখের ভেতরটা। যতবার এই দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় রানা, ততবারই হয় এই অনুভূতি। কঠোর নীতিপরায়ণ, আজীবন ব্রহ্মচারী তীক্ষ্ণধী ওই বৃদ্ধের সামনে যাওয়ার সময় প্রতিবারই বুকের ভেতর কাঁপুনি উঠে যায়।

এই একটি মানুষ, যাঁর সামনে দাঁড়ালে শ্রদ্ধা ভক্তি আর ভালবাসা, সব মিলিয়ে কেমন এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অনুভূতি জাগে রানার মনে। কাঁচাপাকা পুরু একজোড়া ভুরুর নিচের শাণিত দৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছে ভেবে কেমন ভয় ভয়ও লাগে। টাইয়ের নট্ ঠিক করে নিয়ে দরজায় মৃদু নক করল রানা দুবার।

'কাম ইন,' মেঘ ডাকার মত গুরুগম্ভীর, চিরচেনা সেই আহ্বান ভেসে এল। বুড়োর ওই কাম ইনের মধ্যে লুকিয়ে আছে গভীর স্নেহ আর বাৎসল্য, ব্যাপারটা জানা আছে রানার, অথচ শুনলে মনে হয় তেড়ে মারতে আসছে বুঝি।

একটা ফাইলের মধ্যে ডুবে ছিলেন রাহাত খান। রানা ঢুকতে চোখ তুলে চাইলেন একটু। ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবছা ইঙ্গিতে বসে পড়তে বললেন। আবার ডুবে গেলেন কাজের মধ্যে। কয়েক মিনিট চুপচাপ কাটল।

মেজর জেনারেলের পিছনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। বিরামহীন পড়েই চলেছে বৃষ্টি। এ এক বিচ্ছিরি ব্যাপার। টানা তিন দিন হয়ে গেল, অথচ আকাশ পরিষ্কার হওয়ার কোন লক্ষণই নেই এখন পর্যন্ত। চোখ নামিয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকাল রানা। পুরু কাঁচ ঢাকা বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার ওপাশের সেই পিঠ উঁচু রিভলভিং চেয়ারে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছেন মেজর জেনারেল।

ছাই রঙের স্যুট, ইজিপশিয়ান কটনের ধবধবে সাদা শার্ট, ব্রিটিশ কায়দায় বাঁধা দামী ক্রিমসন রঙের টাই, সব মিলিয়ে মানিয়েছে দারুণ বুড়োকে। বয়স

যেন কমে গেছে কয়েক বছর। অবশ্য পাকা ভুরুর সংখ্যা আগের চেয়ে বেড়ে গেছে কিছুটা। ফাইলটা বন্ধ করে মুখ তুললেন রাহাত খান।

'কেমন আছ, রানা?'

'জি, স্যার, ভাল।'

'তোমার সেই সম্মেলন কবে শুরু হচ্ছে যেন?'

'আর তিন দিন পর, স্যার। আটাশ তারিখে।'

'রওনা হতে চাও কবে?'

'সাতাশ তারিখের বিমানের ডিরেক্ট ঢাকা-টোকিও ফ্লাইটেই যাব ভাবছি।'

'তাহলে তো বেশ সময় আছে হাতে,' তর্জনী দিয়ে নাকের ডগাটা একটু চুলকে নিলেন মেজর জেনারেল। 'যাওয়ার পথে যদি একটু রেঙ্গুন ঘুরে যাও···' থেমে গেলেন কথা শেষ না করেই।

'রেঙ্গুন, স্যার?'

'হ্যাঁ, রানা। ওখানে আমাদের দূতাবাসের কমিউনিকেশন সিস্টেম কাল সন্ধের পর অচল হয়ে পড়েছে হঠাৎ করে। তোমার সেই ম্যাজিক ফরটি ফোর ক্রিপটোসাইফার মেশিনটা আর কি, একটা রোটর জ্বলে গেছে ওটার।'

বৃদ্ধের বক্তব্য শেষ হয়নি, বুঝতে পারছে রানা। কথার মাঝখানে কথা বললে বিরক্ত হন তিনি, তাই চুপ করেই থাকল।

'মনে আছে তোমার মেশিনটার কথা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা, 'আছে, স্যার।'

অনেকদিন আগের স্মৃতি মনে পড়ল ওর। পাকিস্তান আমলের কথা, চাইনীজ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ অ্যাডমিরাল হো ইনের বিশেষ অনুরোধে হংকং যেতে হয়েছিল রানাকে একবার। চীন তখন নিজেকে পারমাণবিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন শুরু করে দিয়েছে পুরোদমে। এমনকি মহাশূন্যে রকেট পাঠানোর সব ব্যবস্থাও পাকাপোক্ত করে এনেছে। কিন্তু পশ্চিমা কোন কোন শত্রু ভাবাপন্ন দেশের একেবারেই পছন্দ ছিল না চীনের এই অগ্রযাত্রা। উঠে পড়ে লাগল তারা পিছনে।

হংকঙের কুখ্যাত রেড লাইটনিং টং গ্রুপের প্রধান দস্যু চ্যাঙকে হাত করে তাকে দিয়ে অভিনব সব কায়দায় চীনের একমাত্র ইউরেনিয়াম খনি থেকে ইউরেনিয়াম পাচার করতে শুরু করে তারা। ওখানে গিয়ে কায়দা করে ঢুকে পড়েছিল রানা রেড লাইটনিং টং গ্রুপে। গ্রুপটাকে সমূলে ধ্বংস করতে সাহায্য করেছিল চাইনীজ সিক্রেট সার্ভিসকে। সেই উপকারের জন্যে কৃতজ্ঞ চীন সরকার রানার মাধ্যমে তখনকার পিসিআইকে একটা ক্রিপটোসাইফার মেশিন উপহার দিয়েছিল।

স্বাধীনতার পর রাহাত খান ওটার অনেকগুলো ডুপ্লিকেট তৈরি করিয়েছিলেন বিসিআইয়ের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে। বিদেশে বাংলাদেশের প্রতিটি দূতাবাসে একটা করে আছে এই মেশিন। পৃথিবীর সমস্ত অয়্যারলেস ট্রাফিক ট্যাপ করে তা ডিকোড করা যায় এর সাহায্যে। যে কোন চ্যানেল—আর্মি, ন্যাভাল, এয়ারফোর্স বা ডিপ্লোম্যাটিক বার্তা আদান-প্রদান, মোট কথা দুনিয়ার

কোথায় কি ঘটতে যাচ্ছে, আগেভাগেই জানতে পারে বাংলাদেশ।

দেশের বিরুদ্ধে কোথাও কোন ষড়যন্ত্র চলছে কিনা, বা খুব গুরুত্বপূর্ণ কোন গোপন সংবাদ, জানার প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক, আপনা থেকেই জেনে যায় সব বাংলাদেশ।

স্মৃতির পিঠে স্মৃতি জাগে। চট্ করে মনের পর্দায় ভেসে উঠল দস্যু চ্যাঙের সৎ মেয়ে মায়া ওয়াঙের অপূর্ব সুন্দর মুখটা। চমক ভাঙল রানার রাহাত খানের কথায়।

'রোটরটা রিপ্লেস করা অত্যন্ত জরুরী। ভাবলাম, তুমি তো যাচ্ছই, একটু ঘুরে পৌঁছে দিয়ে যাও জিনিসটা।'

'আমার কোন অসুবিধে নেই, স্যার। এমনিতেই বসে আছি কাজের অভাবে। কোন্ রোটরটা নষ্ট হয়েছে, স্যার, কত নম্বর?'

'আউটার, তিন নম্বরটা।' সামান্য কৌতূহল যেন ঝিলিক মেরে উঠল বৃদ্ধের দু'চোখে। 'ওটার মেকানিজম মনে আছে তোমার এখনও?'

চোখ বুজে ম্যাজিক ফরটি ফোরের মেকানিজমের ব্লু প্রিন্ট মনে করার চেষ্টা করল রানা। অনায়াসেই পুরো প্রিন্টটা ভেসে উঠল মনের পর্দায়। আপনমনে বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'আউটার, থার্ড রোটর, পাশাপাশি দুটো মেটাল প্লেট—বাঁ দিকেরটায় ছয়টা ভেরিয়েব্‌ল ডিপ্রেশন পিন আর সাতটা স্ট্যাটিক পিন। ডান দিকেরটায় পাঁচটা ভেরিয়েব্‌ল ডিপ্রেশন পিন, স্ট্যাটিক পিন আটটা,' চোখ মেলল, 'মনে আছে, স্যার।'

ওর দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছিলেন মেজর জেনারেল। দৃষ্টিতে উপচানো প্রশংসা আর অকৃত্রিম স্নেহ। কিন্তু রানা চোখ মেলতেই চেহারা গম্ভীর করে তুললেন, মুখ নামিয়ে পাইপে তামাক ভরার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

'আজ রাতে রওনা হচ্ছ তুমি। তোমার রওনা হবার খবর আমি জানিয়ে দেব ওখানকার কমিউনিকেশন অফিসারকে। আর হ্যাঁ, কালকের দিনটা রেঙ্গুনেই থাকছ তুমি। আমার ধারণা, ওদেশে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ঘটতে চলেছে।'

'কি রকম?'

'কাল হাইলি ক্লাসিফায়েড একটা কোডেড মেসেজ ট্যাপ করতে শুরু করার সাথে সাথেই জ্বলে গেল হতচ্ছাড়া রোটরটা। সামান্য যেটুকু ট্যাপ করা গেছে, ওখানকার কমিউনিকেশন অফিসার তা ডিকোড করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই যে, পড়ে দেখো,' সামনের ফাইলটা খুলে এক টুকরো কাগজ ওর দিকে এগিয়ে দিলেন বৃদ্ধ। তামাক ভরে বসিয়ে নিলেন পাইপে বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে টিপে।

চোখ কুঁচকে কাগজটার দিকে চেয়ে আছে রানা। তিনটে মাত্র শব্দ লেখা আছে ওতে: **মেজর জেনারেল ইবরা**···

মুখ তুলল ও। 'মেজর জেনারেল ইবরা?'

'ইব্‌রাহিম, মেজর জেনারেল ইব্‌রাহিম।' পাইপ ধরালেন রাহাত খান, একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'রোহিঙ্গা মুসলমান। বর্মী সেনাবাহিনীতে আর

কোন মুসলমান অফিসার নেই এত উঁচুপদে। বুঝতে পারছি না ওঁর ব্যাপারে কী এমন তথ্য থাকতে পারে যা কোডে চালাচালি করার মত গোপনীয়।'

থামলেন বৃদ্ধ। পর পর কয়েকটা টান দিলেন পাইপে। ভাবছেন কিছু একটা চোখ বুজে। 'আমার ধারণা বড় রকম কোন বিপদে পড়তে যাচ্ছেন ভদ্রলোক। রোহিঙ্গাদের ওপর কী অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছে বর্মী সামরিক জান্তা, সে তো জানোই।'

মাথা দোলাল রানা। 'শুধু অমানুষিক বললে পুরোটা বলা হয় না, স্যার।'

'ঠিক। কাল রেঙ্গুনে থাকো তুমি। আমি অন্য সোর্সে এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর করছি, যদি সিরিয়াস কিছু হয়, দূতাবাসের মাধ্যমে জানাব তোমাকে। কালকের মধ্যে যদি যোগাযোগ না করি, তাহলে পরশু চলে যেয়ো তুমি টোকিও। কোনও প্রশ্ন?'

'না, স্যার।'

পাইপ দাঁতে কামড়ে ধরে আরেকটা ফাইল খুলে সামনে ঝুঁকে বসলেন মেজর জেনারেল। সেই সাথে বাঁ হাতে আবছা একটা ইঙ্গিত করলেন রানার উদ্দেশে। পশ্চাদ্দেশ উত্তোলন করতে বলা হলো ওকে।

'সোহেলের সাথে দেখা করো গিয়ে।'

'জ্বি।'

নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ও। সোহেলের রূমে ঢুকে দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজাটা। চমকে উঠল সোহেল। রানাকে গম্ভীর মুখে সরাসরি ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে তুলোধুনার কাজটা এখনই শুরু হয়ে যায় কিনা ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি এক প্যাকেট সিলভার কাট বের করে এগিয়ে দিল ও রানার দিকে। 'নে, দোস্ত, সিগারেট খা। কদ্দিন পর দেখা, তাই না?'

ব্রেক কষল রানা। থাবা দিয়ে প্যাকেটটা নিয়ে বসে পড়ল ওর মুখোমুখি। খুলে দেখল একেবারে নতুন প্যাকেট, পুরো বিশটাই রয়েছে। চেহারাটা প্রশান্ত হয়ে উঠল ওর। একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা টুপ্ করে কোটের পকেটে ফেলল, পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে নাচাতে লাগল প্রবলবেগে। 'তোরা সব অফিসে বসে করিস কি, বল তো! ঘোড়ার ঘাস কাটিস?'

'কেন?'

'নয়তো কি! কোথায় আন্তর্জাতিক বেসরকারী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সম্মেলনে যোগ দিতে টোকিও যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে বসে আছি, আর এখন কি না সে সব ছেড়ে যেতে হচ্ছে রেঙ্গুনে, সামান্য একটা মেশিনের পার্ট পৌঁছে দিতে? এ সমস্ত ছোটখাট কাজ···'

'তাহলেই দ্যাখ,' দাঁত বের করে হেঁ হেঁ করে হাসল সোহেল। 'আমরা তোর প্রতি কত দয়াশীল। কাজ করাই ছোটখাট, অথচ বেতন দিই রাজা-বাদশার সমান।'

'বাজে কথা বন্ধ কর, কি কি দেয়ার আছে দিয়ে দে। মাঝেমধ্যে এসে কাজ করে দিয়ে যাই বলেই না এখনও টিকে আছে প্রতিষ্ঠানটা, আর মাস গেলে তোরাও দুটো পয়সার মুখ দেখিস। নইলে কবে সদরঘাটে গিয়ে খুজলি-

পাঁচড়ার ওষুধ বেচতি।'

পায়ের কাছে রাখা একটা কালো চামড়ার পেটমোটা ব্যাগ টেবিলের ওপর তুলে আনল সোহেল। দেখতে অনেকটা ডাক্তারি ব্যাগের মত। পার্থক্য শুধু মাঝখানে একটা লকিং ল্যাচের বদলে এটার রয়েছে দু প্রান্তে দুটো ল্যাচ। খোলাই ছিল ব্যাগ, ভেতরে তাকাল রানা। ভেতরের লাইনিঙের গায়ে দুটো পকেট, দুটো রোটর প্লেট আলাদা আলাদা করে রাখা আছে ওর মধ্যে। ব্যাগটা বন্ধ করল সোহেল।

'এবার মন দিয়ে শোন,' বলল ও, 'দেখতে যতই নিরীহগোছের মনে হোক না কেন, ব্যাগটা আসলে ভয়ঙ্কর একটা বোমা। কোন আনাড়ি যদি খুলতে চেষ্টা করে, বা ধর, কেউ যদি জোর জবরদস্তি করে খোলে, তাহলে ভেতরের জিনিস আর ব্যাগটা তো যাবেই, সেই সাথে যে খুলবে সে-ও যাবে ফউত হয়ে।

'এর ভেতরের লাইনিংটা স্টাইরোফোমের তৈরি। সাথে থারমাইট প্লাস্টিক জুড়ে দেয়া হয়েছে ভেতর দিকে। ট্রিগারিং মেকানিজমও সেট করা হয়েছে কায়দা করে। কাজেই, নির্ধারিত নিয়ম ছাড়া কেউ যদি যেনতেন ভাবে খুলতে চেষ্টা করে এই ব্যাগ, তাহলেই বুম্!' হাতের তালু চিত করে দেখাল সোহেল।

'হুঁম, শুনেছি এই ধরনের সিস্টেমের কথা।'

'শুধু শুনেছিস, দেখিস্‌নি,' সুযোগ পেয়ে ফোড়ন কাটল সোহেল। ভারিক্কি চালে বলল, 'আজ দ্যাখ্, দেখে সার্থক কর জীবনটা। এবার শিখে নে কি করে খুলতে হয়।'

ব্যাগটার একদিকে সাঁটা মিকি মাউসের একটা স্টিকার দেখিয়ে বলল, 'এটা হচ্ছে সামনের দিক। ব্যাগ খোলার সময় এটা রাখবি পেটের দিকে। এবার খেয়াল কর,' এক ইঞ্চি লম্বা, কোল্ড ড্রিঙ্কসের স্ট্র-র মত মোটা, গোল দুটো স্টেইনলেস স্টীলের পিন দেখাল ওকে সোহেল। হাতলের দু-প্রান্ত যেখানে ব্যাগের সাথে মিশেছে, সেখানে দুটো ফুটোর দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বলল, 'ব্যাগ খোলার আগে এই পিন দুটো অবশ্যই এই দুই ফুটোয় ভরে নিতে হবে। এরপর প্রথমে বাঁ দিকের ল্যাচটা আস্তে করে বাইরের দিকে ঠেলে দিবি এক ইঞ্চিমত। পরে ডান দিকেরটাও একইভাবে ঠেলে দিবি। মনে রাখবি, উল্টোপাল্টা হয় না যেন। আগে বাঁ দিকেরটা, পরে ডান দিকেরটা। ব্যস, খুলে গেল ব্যাগ। তবে আসল হচ্ছে এই পিন, এগুলো ছাড়া কাজ হবে না। জোর জবরদস্তি করে খোলা হয়তো যাবে, কিন্তু সাথে সাথেই বুম্! বুঝলি?' কথার সাথে হাত চলছিল সোহেলের, ব্যাগটা খুলে দেখাল ও।

'ভেতরে প্লেট দুটো ছাড়া কিছু নেই, হালকা লাগছে খুব। পারলে কিছু খবরের কাগজ বা বইপত্র ভরে নিস। নে, এবার প্র্যাকটিস কর কয়েকবার।'

'দরকার নেই। কিন্তু, দোস্ত, এ নিয়ে ঝামেলায় পড়ি যদি রেঙ্গুন কাস্টমসের চেকিঙের সময়? তাছাড়া, এই ছোট্ট দুটো জিনিসের জন্যে এতবড় ব্যাগের কি দরকার?'

'তোর ব্যাগ চেক করবে না ওরা। কারণ ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টে যাচ্ছিস তুই, ছদ্মনামে। আর ব্যাগটা পাঠানো হচ্ছে রেঙ্গুন দূতাবাসের জন্যে। অনেক সময় অনেক জরুরী ছোটখাট জিনিস আনা নেয়ার কাজে এই ব্যাগ ইউজ করতে পারবে ওখানকার অফিশিয়ালরা। আর সব দূতাবাসেও পাঠানো হয়েছে এর একটা করে। রাত ন'টায় ছাড়বে তোর প্লেন। কোনও প্রশ্ন?'

হাত বাড়িয়ে খপ্ করে সোহেলের বাঁ কানটা মুচড়ে ধরল রানা। 'কি বললি?'

কাকুতি মিনতি শুরু করল সোহেল। 'ভুল হয়ে গেছে, ভাই, মাফ করে দে, তোর খোদার কসম লাগে। উফ্ শালা! ছিঁড়ে গেল তো কানটা!' কাত হয়ে টেবিলের ওপর প্রায় শুয়ে পড়ল ও।

'আর কখনও নকল করবি বুড়োর গলা?'

'না, দোস্ত, জীবনেও না। পাগল নাকি! ছেড়ে দে, বাপ্।'

'কী? আমি তোর বাপ্?'

'না···পুত্র!' বলেই টেবিলের তলা দিয়ে কষে একটা লাথি মারল সোহেল।

দুই উরুর মাঝখানটা বাঁচাতে লাফিয়ে সরে গেল রানা কান ছেড়ে দিয়ে। ঠিক এই সময় দু কাপ কফি নিয়ে কামরায় ঢুকল সোহেলের সেক্রেটারি। বিস্মিত হয়ে এর-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল মেয়েটা।

'কি ব্যাপার? আবার মারামারি করছেন আপনারা?'

'কোথায়!' আকাশ থেকে পড়ল দুজন। ট্রে থেকে একটা কাপ তুলে নিয়ে যথেষ্ট দূরে চেয়ার টেনে বসল রানা, কপট গাম্ভীর্যের সাথে অন্য কাপটা তুলে নিল সোহেল।

আপোসের নমুনা হিসেবে নিজের সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল রানা সোহেলের দিকে। খুশি হয়ে উঠেছিল সোহেল, কিন্তু প্যাঁচা হয়ে গেল মুখটা যখন দেখল মাত্র একটা সিগারেট রয়েছে ওতে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা লক্ষ করছিল এতক্ষণ মেয়েটা, একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে দোলাতে ঘুরে নিজের কামরার দিকে চলে গেল। ভাবখানা যেন এ দুটো আর মানুষ হবে না কোনদিন। দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই আচমকা হা হা করে হেসে উঠল দুই অভিন্ন হৃদয় বন্ধু।

তিন

ঘুমিয়ে ছিল রানা। আচমকা একটা ধাক্কা খেয়ে উঠে বসল ধড়মড় করে। ডিম লাইট জ্বলছে প্লেনের ভেতর। গভীর ঘুমে মগ্ন যাত্রীরা সবাই। পাশের সীটে বডি বিল্ডারকে বসা দেখে চোখ কোঁচকাল ও। 'কি ব্যাপার?'

'এসে গেছে রেঙ্গুন,' বলল লোকটা। 'তৈরি হয়ে নিন।'

কটমট করে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকল রানা, ইচ্ছে হলো এক থাপ্পড়ে খসিয়ে দেয় ব্যাটার চারটে দাঁত। কিন্তু বিন্দুমাত্র পাত্তা দিল না লোকটা, রানা কিছু বলার আগেই উঠে দাঁড়াল, ক্ষিপ্র পায়ে হেঁটে চলে গেল নিজের আসনের দিকে।

চাউনি দিয়ে তাকে ভস্ম করতে ব্যর্থ হয়ে বাইরে তাকাল। গাঢ় অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়ে ঝিমুচ্ছে ধরণী। মাথার মধ্যে ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে ওর। লোকটা কে আসলে? বাঙালী যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কথায় কুমিল্লার আঞ্চলিক টান পরিষ্কার। দেহের শক্ত পোক্ত গঠন আর ক্রু কাট্ চুল দেখে মনে হয় আর্মির লোক। কিন্তু ওর পিছনে লাগল কেন ব্যাটা? লোকটার গায়ে পড়া আচরণ, কথাবার্তা, সবই কেমন যেন ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে। কিছুই বুঝতে পারছে না রানা।

বাল্কহেড উইন্ডোর গায়ে কয়েকটা ছায়া পড়তে ঝট্ করে ঘুরে তাকাল ও। ফিরে এসেছে লোকটা, আরও দুজন রয়েছে এবার সঙ্গে। তাদের একজনের ওপর চোখ আটকে গেল রানার। টেনেটুনে বড়জোর পাঁচ ফুট পাঁচ হবে মানুষটা, কিন্তু বুকের বেড় কম করেও আটচল্লিশ ইঞ্চি। হাফ হাতা শার্ট আর ট্রাউজার পরেছে লোকটা। ঘন লোমে ভরা থোকা থোকা পেশীবহুল দুটো হাত দেখলে ভীমের গদার কথা মনে পড়ে। ক্রু কাট্ চুল, গালে চাপ দাড়ি। সব মিলিয়ে গরিলার মত লাগছে লোকটাকে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে রানার মুখের দিকে।

অন্যজন লম্বায় প্রায় রানার সমানই হবে। এ-ও ক্রু কাট্। বাঁ হাতে বড়সড় একটা রাকস্যাক ঝুলছে। ছোট্ট রেডক্রিসেন্ট প্রতীক আঁকা ওটায়। বাঁ ভুরুর ওপর থেকে নিয়ে চুলের রেখা পর্যন্ত লম্বা একটা কাটা দাগ রয়েছে লোকটার, শুকনো।

প্রথমজন বসে পড়ল রানার পাশে। অন্য দুজন বসল আইলের ওপাশের সীটে।

'আমাদের প্ল্যানে সামান্য রদবদল হয়েছে,' চাপা গলায় রানার উদ্দেশে বলল বডি বিল্ডার।

'মানে! কিসের প্ল্যান?'

ককপিটের দরজার ওপর দুটো লাল আলো জ্বলে উঠল এই সময়:

NO SMOKING

FASTEN YOUR SEAT BELT PLEASE

ভেতরের উজ্জ্বল আলো জ্বেলে দেয়া হয়েছে আগেই। রানার প্রশ্নটা মনে হলো শুনতে পায়নি, সীট বেল্ট বেঁধে নিয়ে দু পা লম্বা করে মেলে দিয়ে বসল লোকটা আরাম করে। এই সময় শুরু হলো ক্যাপ্টেনের গৎ বাঁধা অ্যানাউন্সমেন্ট। প্রথমে বাংলা, পরে ইংরেজিতে যাত্রীদের ধন্যবাদ জানাল সে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসে ভ্রমণ করার জন্যে।

অ্যানাউন্সমেন্ট থামতে রানার দিকে সামান্য ঝুঁকে এল বডি বিল্ডার। তেমনি চাপা গলায় বলল, 'শুনুন, সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, এয়ারপোর্ট টার্মিনাল

এড়িয়ে যাব আমরা, বুঝলেন? নিরাপত্তার খাতিরেই আর কি,' একটু হেসে কাঁধ ঝাঁকাল সে অসহায় ভঙ্গিতে। 'কি আর করা!'

অবাক হয়ে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে থাকল রানা। 'কি বলছেন এসব আপনি! কিছুই তো বুঝতে পারছি না আমি!'

ঘুরে সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকাল লোকটা। পরিষ্কার বিরক্তি ফুটে উঠল কণ্ঠে, 'অ্যাকটিং বন্ধ করুন তো। আপনার অ্যাকটিং দেখার মত মনের অবস্থা নেই আমার। এমনিতেই বহুত টেনশনে আছি।'

কপাল কোঁচকাল রানা। 'আচ্ছা ঝামেলা! অ্যাকটিং আমি করছি, না আপনি? ভুল করে কাকে…'

'ফের?' এবার সত্যি সত্যি রেগে গেছে লোকটা। চোখ গরম করে বলল, 'ন্যাকা! জানেন না কিসের কথা বলছি? হাওয়া খেতে রেঙ্গুন এসেছেন নাকি আপনি আমাদের সাথে?'

'আপনাদের সাথে! আমি?' আকাশ থেকে পড়ল রানা, 'আমি আপনাদের সাথে এসেছি?'

ওর চোখমুখের ভাব দেখে একটু যেন দ্বিধায় পড়ে গেল বডি বিল্ডার। ইতস্তত করতে লাগল, 'আপনি…আপনি, হাসান সাহেব না?'

এবার অবাক হওয়ার পালা রানার। এই লোক কি করে জানল ওর ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টের ছদ্মনাম? নিজের অজান্তেই মাথা দোলাল ও। 'হ্যাঁ।'

'তো?'

'তো কি?'

'থামুন!' কষে একটা দাবড়ি লাগাল লোকটা। 'আর একটা কথাও শুনতে চাই না। এখন থেকে আমার প্রত্যেকটা নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবেন আপনি মিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত। অলরাইট?'

'আপনি ভুল করছেন,' কঠিন গলায় বলল রানা। 'আপনাকে চিনি না আমি।'

প্রচণ্ড রাগে চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল লোকটার। ভয় হলো এখনই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে রানার ঘাড়ের ওপর। নাকের ফুটো ঘন ঘন স্ফীত হচ্ছে, নিঃশ্বাস ছাড়ছে ঝড়ের বেগে। ওদিকে আইলের ওপাশ থেকে রানার মুখের দিকে চেয়ে আছে অন্য দুজন। গরিলার মুখে মিটিমিটি হাসি। শুভেচ্ছার নাকি ব্যঙ্গের, বোঝা গেল না সঠিক।

ভেতরে ভেতরে শক্ত হয়ে গিয়েছিল রানা। প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল আক্রমণ ঠেকানোর জন্যে। কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল বডি বিল্ডার। উল্টে অমায়িক হেসে বলল, 'এই দেখো, এখনও পর্যন্ত নিজের পরিচয়টাই তো জানাইনি আপনাকে। কি করে চিনবেন? সরি, ভাই। ভুল হয়ে গেছে। আমি জাহেদ, ক্যাপ্টেন জাহেদ। মিশন লীডার। এ হচ্ছে,' গরিলার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'গোরা। আর ও জসিম। এবার সন্তুষ্ট? যাক্‌গে, শুনুন। সময় থাকতে বাকি…'

একটা হাত তুলল রানা। 'জাহেদ সাহেব, আপনার কোন কথা শোনার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার। এবার দয়া করে থামুন, বন্ধ করুন আপনার প্যান প্যানানি। ভুল হচ্ছে আপনার। আমি আপনার লোক নই।'

থমকে গেল জাহেদ। মুখে সামান্য এক চিলতে হাসি ছিল, দফায় দফায় মিলিয়ে গেল সেটা। ঝাড়া এক মিনিট পলকহীন চোখে রানার মুখের দিকে চেয়ে থাকল সে। দু চোখ জ্বলছে ধক্ ধক্ করে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তাই মনে হচ্ছে আপনার, না? হাসান সাহেব, সেধে বিপদ ডেকে আনছেন আপনি। রেঙ্গুন ট্যুর দিতে আসিনি আমরা, এসেছি একটা মিলিটারি মিশন নিয়ে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এখনও বাকি, অথচ সেসব বলতে না দিয়ে অহেতুক সময় নষ্ট করছেন আপনি আমার। আমি চাই না আমাদের সম্পর্কটা তেতো হোক, কিন্তু ভাব দেখে মনে হচ্ছে আপনি চাইছেন।'

'আগে আমার একটা কথা···'

'নো! শাট্ ইওর ডার্টি মাউথ আপ, ইউ ব্লাডি সিভিলিয়ান! আর একটা শব্দ মুখ দিয়ে বের করলে···' থেমে গেল জাহেদ কথা শেষ না করেই।

যাত্রীরা সবাই সীট বেল্ট বেঁধেছে কি না পরীক্ষা করে দেখছে সেই বিমানবালা। সামনে এসে রানা আর জাহেদের বেল্ট দুটো টেনে দেখল সে। তার সাথে চোখাচোখি হতে কাষ্ঠ হাসি হাসল জাহেদ।

এক মিনিট পর বাম্প করল বোয়িং, মিঙ্গালাদনের রানওয়ে স্পর্শ করেছে চাকা।

আচ্ছা ফ্যাসাদেই পড়া গেল তো! ভাবছে রানা, এ কোন্ যন্ত্রণা? কার বদলে কাকে নিয়ে টানাটানি করছে ব্যাটা! আলতো করে শোল্ডার হোলস্টারটার স্পর্শ নিল ও। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে এটা ব্যবহার করাটা কি ঠিক হবে? নাকি অপেক্ষা করে দেখবে রানা? লোকটাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি···।

হাসান কথা বলছে না, তার মানে ভয় পেয়েছে লোকটা, সিদ্ধান্তে পৌঁছুল জাহেদ। একটু নরম হলো। অভয় দেয়ার জন্যে বলল, 'জানি, মনে মনে ঘাবড়ে গেছেন আপনি অ্যাকশনের কথা ভেবে। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকুন, হাসান সাহেব, আপনার নিরাপত্তার ভার আমি নিলাম। শুধু আমার নির্দেশ মেনে চলুন শেষ পর্যন্ত, দেখবেন, কত সহজে মিটে গেছে সব।'

লোকটার আত্মবিশ্বাস দেখে অবাক হলো রানা। জেদি, একগুঁয়ে মানুষ সন্দেহ নেই। জীবনে এরা কমই হারে, ব্যাপারটা জানা আছে ওর।

'রেঙ্গুনে বিমানের আধঘণ্টা হল্টেজ,' আবার বলে উঠল সে। 'ল্যান্ডিঙের পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে সবার অলক্ষে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে যাব আমরা অ্যালার্ট থাকবেন।'

কিছুই বলল না রানা। মাথার মধ্যে একশো মাইল বেগে দুইশো রকম চিন্তাভাবনা চলছে ওর। ভেবে পাচ্ছে না কি করে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। সেই সাথে মনের ভেতরে একটা আগ্রহও মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ওর। জানতে ইচ্ছে করছে, বাংলাদেশ থেকে কোন্ বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে এ

দেশে এসেছে এরা। মিশনটা কিসের?

'একটা কথা কি জানেন, দেশসেবার চাইতে বড় আর কিছুই হতে পারে না। এরচে' মহান কিছু নেই। মনে মনে ভাবুন, দেশসেবা করতে এসেছেন আপনি, দেখবেন সমস্ত ভয়-ডর উধাও হয়ে গেছে মন থেকে। আপনি সিভিলিয়ান বলেই এত কথা বলছি। ওঁদের মত আর্মি পারসন হলে তার দরকার হত না।'

'আপনার সব কথাই বুঝতে পারছি আমি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'কিন্তু আপনি আমার কথা বুঝছেন না। শুনুন, জাহেদ সাহেব, কাকে আপনি আশা করছিলেন আমি জানি না, কিন্তু আমি সেই লোক নই। আপনার মিশন সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই আমার।' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু চোখের পলকে নড়ে উঠল লোকটা।

রানার ডান হাতের নিচ দিয়ে কিছু একটা এগিয়ে এসে সজোরে আঘাত করল ওর পাঁজরে। আঁধার হয়ে এল সবকিছু, দম বন্ধ হয়ে এল রানার।

'দেখো!' হিস্ হিস্ করে বলল জাহেদ। 'সাবধানে তাকাও, দেখো আমার হাতে এটা কি।'

চোখ নামিয়ে তাকাল রানা। একটা পয়েন্ট থ্রী এইট পুলিস স্পেশাল ঠেসে ধরে আছে লোকটা ওর পাঁজরে। 'আমি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত মুখ খুলবে না তুমি আর। যদি খুলেছ, পরিণতির জন্যে তুমিই দায়ী থাকবে,' হাত সরিয়ে নিল সে।

ধীর গতিতে টার্মিনাল ভবনের দিকে এগিয়ে চলেছে বিমান, গতি ক্রমেই আরও কমছে, থেমে দাঁড়াবে যে কোন মুহূর্তে।

উঠে দাঁড়াল জাহেদ। হাত ইশারায় গরিলাকে কাছে ডাকল। রানাকে দেখিয়ে বলল, 'এর দিকে খেয়াল রাখো, আমি আসছি।'

দ্রুত পায়ে ককপিটে গিয়ে ঢুকল লোকটা, দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল ভেতর থেকে। গোরা এসে বসল তার শূন্য আসনে। রানার দিকে একবারও তাকাল না লোকটা, জানালা দিয়ে চেয়ে আছে বাইরের দিকে। দু মিনিট পরই বেরিয়ে এল জাহেদ। চেহারা একটু যেন খুশি খুশি লাগছে। কাছে এসে গোরার উদ্দেশে বলল, 'তৈরি থেকো। পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে ঘটবে ব্যাপারটা। এই লোকটাকে নামাবার দায়িত্ব তোমার।'

'জ্বি, স্যার।' উঠে দাঁড়িয়ে নিজের আসনের দিকে পা বাড়াল গোরা।

এই সময় একটা অস্বাভাবিক তৎপরতা চোখে পড়ল রানার। একজন-দুজন করে বিমানবালা আর কেবিন-ক্রু গিয়ে ঢুকছে ককপিটে, প্রায় সাথে সাথেই আবার বেরিয়ে আসছে তারা। বেরিয়েই কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে সামনের সারির চার যাত্রীর দিকে তাকাচ্ছে সবাই একবার করে, তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ছে যার যার কাজে। দ্বিতীয়বার ভুলেও আর তাকাচ্ছে না এদিকে, এমন ভাব করছে যেন অস্তিত্বই নেই ওদের।

পাশে তাকাল রানা। মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে আছে জাহেদ। দু চোখ ককপিটের দরজার ওপর নিবদ্ধ। রানা ওর দিকে চেয়ে আছে বুঝেও ফিরল

না। বাইরে তাকাল রানা। দাঁড়িয়ে পড়েছে বোয়িং। বার্মা বিমান সংস্থার ছাপমারা একটা গ্যাঙওয়ে এসে দাঁড়িয়েছে গা ঘেঁষে। টার্মিনাল ভবনের দিকে চাইল ও, বড় বড় চারটে ফ্লাডলাইট জ্বলছে মাথায়। প্রায় দিনের মত আলো করে রেখেছে অনেকখানি জায়গা।

দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। এক এক করে মোট সতেরোজন যাত্রী নেমে গেল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সেই সুন্দরী বিমানবালা মুখস্থ বিদায় সম্ভাষণ জানাল সবাইকে। মুখে আড়ষ্ট হাসি।

নেমে যাবে কি না একবার ভাবল রানা। ইচ্ছে করলে খুব সহজেই নেমে যেতে পারে ও ওয়ালথার দেখিয়ে, কিন্তু এত যাত্রীর মধ্যে সে ঝুঁকি নেয়াটা ঠিক হবে না। তাছাড়া এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির কারও চোখে যদি ব্যাপারটা ধরা পড়ে তাহলেই হয়েছে। বার্মা সরকারের রাষ্ট্রীয় অতিথিখানার মেহমান হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না কারও। এরা কি মিশনে এসেছে কে জানে, ভণ্ডুল করে দেয়াটা উচিত হবে বলে মনে হলো না ওর; হয়তো দেশের কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজেই এসেছে।

ভেবেচিন্তে অপেক্ষা করারই সিদ্ধান্ত নিল রানা। দেখা যাক, কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। ধৈর্য ধরলে এদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার একটা উপায় হয়তো পাওয়া যাবে পরে। এক এক করে পনেরো মিনিট কেটে গেল, উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ছাড়াই। আরও তিন মিনিট পর ঘটল ঘটনাটা—শেষ যাত্রীটিও তখন ঢুকে পড়েছে টার্মিনাল ভবনের ভেতরে।

আচমকা অত্যুজ্জ্বল নীলচে একটা আভা ঝলসে উঠল, পলকের জন্যে পুরো এয়ারপোর্ট উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সে আলোয়, সেই সাথে বজ্রপাতের মত প্রচণ্ড কড়াৎ শব্দ। পরমুহূর্তে দপ্ করে নিভে গেল বিমানবন্দরের সব আলো, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল সব।

'মুভ!' চাপা হুঙ্কার ছেড়েই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল জাহেদ। পরক্ষণে দুহাতে রানার কোটের ল্যাপেল দুটো আঁকড়ে ধরে হ্যাঁচকা টান মারল গোরা, শূন্যে উঠে গেল রানা আসন ছেড়ে। হোল্ড থেকে ওর ব্রীফকেস বের করে নিয়েছে এর মধ্যে জাহেদ, ওদের পাশ কাটিয়ে তীরবেগে নিচের দিকে ছুটল সে। আবছাভাবে দেখতে পেল রানা, লোকটার এক হাতে ওর ব্রীফকেস্, অন্যহাতে রোটরের ব্যাগ শোভা পাচ্ছে।

গ্যাঙওয়ের মাথায় এনে নামিয়ে দিল ওকে গোরা, পিছন থেকে পিঠে ধাক্কা মেরে ঠেলে দিল সামনের দিকে। 'নামেন!'

ইমার্জেন্সি জেনারেটর চালু হয়ে গেছে এয়ারপোর্টের। সামনের ফ্লাড লাইটগুলো জ্বলে উঠল, কিন্তু বড্ডো দুর্বল আলো। দূর থেকে বালব্গুলোর ভেতরের আঁকাবাঁকা লালচে ফিলামেন্ট পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

পিছন থেকে গরিলার ধাক্কা গুঁতো খেতে খেতে নেমে এল রানা। গ্যাঙওয়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে এক লোকের সাথে নিচু গলায় খুব দ্রুত কি আলাপ করছে জাহেদ। ওরা সবাই নামতে ঘুরে দাঁড়াল আগন্তুক। 'ফলো মি,' বলে হনহন করে হেঁটে চলল সে আগে আগে। লোকটাকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিল

জাহেদ, পিছন থেকে থাবা দিয়ে তার কোটের কলার মুঠো করে ধরল রানা।

'আমার ব্যাগটা!'

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল জাহেদ। মাথায় রক্ত চড়ে গেছে রানার ব্যাগ চাওয়ার ধরন দেখে।

'আমার ব্যাগটা!' একই সুরে, একই ভঙ্গিতে বলল রানা। বাঁ হাত বাড়িয়ে রেখেছে ব্যাগের দিকে।

'কাম, কুইক!' প্লেনের পেটের নিচে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আগন্তুক। 'কামন, ম্যান!'

ঝামেলা বেধে যেতে পারে ভেবে বহুকষ্টে নিজের রাগ দমন করল জাহেদ। ব্যাগ এগিয়ে দিল রানার দিকে। ব্রীফকেসটা দিল গোরার হাতে। 'লেটস গো!' হোলস্টার থেকে পুলিস স্পেশালটা বের করে নিয়েছে সে।

প্লেনের নিচ দিয়ে ওপাশে চলে গেল দলটা, তারপর ছুটল নিঃশব্দ পায়ে। আগন্তুক লোকটার পিছনেই রয়েছে গোরা, তার পিছনে জসিম। রানা আর জাহেদ সবার পিছনে, পাশাপাশি ছুটছে। সতর্ক নজর রেখেছে লোকটা রানার ওপর। পালাবার চেষ্টা করলে বাধা দেবে।

এক দৌড়ে রানওয়েতে উঠে এল ওরা। তারপর আবার ছুটল যে প্রান্তে বোয়িং ল্যান্ড করেছে, তার বিপরীত প্রান্তের দিকে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে চার-পাঁচ হাতের ওপাশে দেখা যায় না কিছুই, সম্পূর্ণ অনুমানের ওপর নির্ভর করে ছুটছে সবাই আগন্তুকের পিছন পিছন। রানওয়ের শেষ মাথায় একটা পাঁচ টনি ট্রাক দেখা গেল আকাশের পটভূমিতে, দাঁড়িয়ে আছে খোলা মাঠে। লাফিয়ে ওটার ক্যারিয়ারে উঠে পড়ল পথ প্রদর্শক, গোরা আর জসিম।

'আপনি সামনে,' রানার উদ্দেশে অস্ত্র নাচাল জাহেদ।

ওকে মাঝখানে বসিয়ে সে বসল ওপাশের জানালার ধারে। মৃদু গর্জন করে স্টার্ট নিল ট্রাক, এবড়োখেবড়ো মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে চলল নাচতে নাচতে। দূর থেকে দেখা যাবে বলে হেডলাইট জ্বালেনি ড্রাইভার, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে চায় সে। ড্যাশবোর্ডের মৃদু আলোয় লোকটার মুখের এপাশটা দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে।

বার্মিজ বলেই মনে হলো রানার। মুখটা প্রকাণ্ড, থুতনির কাছে গিজগিজ করছে কয়েকদিনের না কামানো দাড়ি। একমনে গাড়ি চালাচ্ছে, ওদের দিকে একবারও ফিরে তাকায়নি এ পর্যন্ত।

'কারা এরা?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'বন্ধু,' বলল জাহেদ।

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কি ধরনের বন্ধু?'

'চুপ করে বসে থাকুন!' ঝাঁঝিয়ে উঠল সে। রানার ওপর রেগে টং হয়ে আছে, লোকটা ওর কলার ধরার স্পর্ধা দেখিয়েছে, কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

আর কিছু জিজ্ঞেস করল না রানা। লোকটা মুখে কিছু না বলুক, ভাবছে রানা, এরা যে বাংলাদেশ আর্মি ইন্টেলিজেন্সের লোক, সে ব্যাপারে কোন

সন্দেহ নেই এখন আর। কিন্তু এ দেশে কি কাজ এদের, ভেবে পাচ্ছে না ও। মনের মধ্যে হাজারটা প্রশ্ন, হাজারো সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মারছে, অথচ কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এদের সাথে কিছুতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। জীবনে কখনও এ ধরনের পরিস্থিতিতে পড়তে হয়নি বলেই হয়তো বেশি অস্বস্তিতে ভুগছে ও।

কোথাও কোন ভুল হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। ভাবল রানা, এ না হয়েই যায় না। কিন্তু কোথায়? কি যেন একটা মনে পড়ব পড়ব করছে, অথচ মনে পড়ছে না। মনে হচ্ছে ভুলটা কোথায় হয়েছে, যেন জানে ও। ওর অবচেতন মন মূক ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু যেন বোঝাতে চাইছে ওকে অনেকক্ষণ থেকেই, কিন্তু ব্যাপারটা কি, ধরতে পারছে না রানা।

দূর ছাই! ওসব কিছু না। আসল কথা হচ্ছে, জাহেদের ভুল হচ্ছে। ওদের এই যোগাযোগ দৈব-সংযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা, আরও দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই ব্যাপারটা খোলসা হয়ে যাওয়া ভাল। লাফ-ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে ট্রাকের, মাঠ ছেড়ে পাকা রাস্তায় উঠে এসেছে ওটা। এখনও হেডলাইট জ্বালানো হয়নি।

'মিস্টার জাহেদ, একটা প্রশ্নের উত্তর চাই আমার। এখনই।'

রানার বলার মধ্যে কাঠিন্য প্রকাশ পেল, ব্যাপারটা কান এড়াল না জাহেদের। ফিরে তাকাল সে, 'মিশন সম্পর্কিত কিছু?'

'ওটা পরে জানতে চাইব। আগে অন্য একটা ব্যাপার জানতে চাই।'

'অন্য ব্যাপারে যত খুশি প্রশ্ন করতে পারেন, তবে মিশন সম্পর্কে নয়।'

পাত্তা দিল না রানা। বলল, 'প্লেনের প্যাসেঞ্জার লিস্টে আমার নাম আছে···'

'নেই।'

'মানে?'

'নেই মানে নেই। সোজা কথাটা বুঝতে পারছেন না? আমাদের চারজনের একজনেরও নাম নেই ওতে।'

থমকে গেল রানা উত্তর শুনে। তারপর বলল, ' আমাদের দূতাবাস থেকে আমাকে রিসিভ করার জন্যে লোক আসার কথা ছিল, আমি আসিনি দেখে সে নিশ্চই খোঁজখবর করতে শুরু করে দেবে।'

'করবে না। কারণ, ঢাকা ছাড়ার আগেই প্ল্যান পরিবর্তন করেছি আমি। কথাটা প্রথমেই আপনাকে জানিয়েছি, মনে হয় ভুলে গেছেন। কাজেই ও নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই।'

বেমক্কা ঝাঁকি খেয়ে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানা ও জাহেদ। রাস্তা ছেড়ে আবার মাঠে নেমে পড়েছে ট্রাক। কোনরকমে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে বসল ওরা, ড্যাশবোর্ড আঁকড়ে ধরে বসে থাকল শক্ত হয়ে। একটু পর হেডলাইট জ্বেলে দিল ড্রাইভার, উজ্জ্বল আলোর দুটো ধারা ছুটে গেল অন্ধকারের চাদর ভেদ করে।

ঝাঁকি খেতে খেতে একটা সরু রাস্তায় উঠে এল ট্রাক আবার, গিয়ার

বদলে এক্সিলারেটর দাবিয়ে ধরল ড্রাইভার ফুটবোর্ডের সাথে। হঠাৎ সামনেই একটা গার্ড পোস্ট দেখা গেল। এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি হবে হয়তো, ভাবল রানা। সোজা ওদিকেই ছুটছে গাড়ি। ঘাড় ঘুরিয়ে ক্যাবের পিছনের চৌকো ছোট্ট জানালাটা দিয়ে পিছনদিকে তাকাল রানা। জানালা জুড়ে বসে আছে গরিলা, হাতে একটা ওয়েবলি অ্যান্ড স্কট, রানার মাথার পিছনদিক সই করে ধরে আছে। চোখাচোখি হতে একটু হাসল গোরা।

মুখ ফিরিয়ে নিল রানা। সাথে সাথে চোখ কুঁচকে উঠল। গার্ড পোস্টটা অনেক কাছে এসে পড়েছে, খাকি পোশাক পরা কুণ্ডলী পাকানো একটা দেহ পড়ে থাকতে দেখল রানা ওটার সামনে। হঠাৎ নড়ে উঠল দেহটা, উঠে বসল ধীরে ধীরে, মাথা ঝাঁকাচ্ছে—ভেতরে ট্রাক নিয়ে ঢোকার সময় এরাই বোধহয় পিটিয়ে অজ্ঞান করে রেখে গিয়েছিল গার্ডটাকে।

ট্রাকের গর্জন কানে যেতে সচকিত হলো লোকটা, তাড়াতাড়ি উঠে বসল হাঁটুতে ভর দিয়ে। হেডলাইটের আলোয় পাশেই পড়ে থাকা নিজের রাইফেলটা দেখতে পেয়ে থাবা দিয়ে তুলে নিল সে ওটা, ট্রাক লক্ষ্য করে তুলল।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তখন। জানালা দিয়ে বাঁ হাত বের করে দিয়েছে জাহেদ, বিন্দুমাত্র দেরি না করেই টেনে দিল সে পয়েন্ট থ্রী এইটের ট্রিগার। আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল গার্ড রাইফেল ছেড়ে দিয়ে, বাঁ হাতে খামচে ধরে আছে বুকের মাঝখানটা। সাঁ করে তাকে পাশ কাটাল ট্রাক।

ঘুরে চওড়া আলোকিত একটা রাস্তায় উঠে এল, ছুটে চলল তীব্রগতিতে। কিন্তু কয়েক মাইল যেতেই সন্দিহান হয়ে উঠল রানা। পথের দু ধারের বাড়িঘরের সংখ্যা একটু একটু করে কমে আসছে বলে মনে হলো ওর। তার মানে শহরের দিকে নয়, সম্পূর্ণ উল্টোদিকে চলেছে ওরা। ক্রমেই সরে যাচ্ছে রেঙ্গুনের কেন্দ্র থেকে দূরে।

'কোথায় চলেছি আমরা?' জাহেদের দিকে ফিরল রানা।

'গেলেই দেখতে পাবেন।'

চুপ করে গেল ও। বসে থাকল ব্যাগ কোলে নিয়ে। কয়েকবার ডানে-বাঁয়ে করল ট্রাক। তারপর একটা বাজারের মধ্যে দিয়ে ছুটল আবার। দুপাশে অসংখ্য সাইনবোর্ড, প্রায় সবগুলোই বর্মী ভাষায় লেখা, কিছুই বুঝল না রানা। শুধু হোন্ডা, এক্সাইড ব্যাটারি, হ্যাডফিলডস্ পেইন্টস ইত্যাদি কয়েকটা সাইনবোর্ড ইংরেজিতে লেখা বলে পড়া গেল।

বাজার ছাড়িয়ে আবার বড় রাস্তায় উঠল ট্রাক।

চার

আরও দু মাইল এগিয়ে গাড়ি দাঁড় করানো হলো। আগেই অফ করে দেয়া

হয়েছে হেডলাইট। জায়গাটা অন্ধকার, রাস্তায় একেবারেই আলো নেই। পিছনের ক্যারিয়ার থেকে ঝপাঝপ্ নেমে পড়ল পথ প্রদর্শক, গোরা আর জসিম। জানালার পাশে এসে জাহেদের উদ্দেশে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলল প্রথমজন, 'নেমে আসুন। গাড়ি বদল করব আমরা।'

ইগনিশন থেকে চাবি খুলে নিয়ে ড্রাইভার নেমে পড়েছে ততক্ষণে। জাহেদ আর রানাও নেমে এল। 'কোথায় গাড়ি?' জানতে চাইল জাহেদ।

'ওই যে,' একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ফোক্সওয়াগেন মাইক্রোবাস দেখাল লোকটা।

দ্রুত পা চালাল ওরা। জাহেদের নীরব ইশারায় রানার একেবারে গা ঘেঁষে চলছে গোরা। রানার ব্রীফকেসটা ওর বাঁ হাতে। জসিম লোকটার কোনও খেয়ালই নেই রানার দিকে, এ পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি। নিজের ভারী রাকস্যাক নিয়েই ব্যস্ত। ডাক্তারি যন্ত্রপাতি আছে হয়তো ওটায়, ভাবল রানা। বেশ ভারী বোঝা যায়, স্ট্র্যাপগুলো টানটান হয়ে আছে।

ওদের দেখতে পেয়ে মাইক্রোবাসের ড্রাইভারের আসন থেকে নেমে এল এক তালগাছ। কম করেও ছয় ফুট সাত আট ইঞ্চি লম্বা হবে লোকটা। তেমনি ছিপছিপে। কাঠির মত সরু সরু হাত দুটো প্রায় হাঁটু ছুঁয়েছে।

'সব ঠিক আছে?' জিজ্ঞেস করল পথ প্রদর্শক।

'জ্বি, স্যার,' গমগম করে উঠল লম্বু। প্রায় চমকেই উঠল রানা লোকটার গলা শুনে। বাবারে বাবা! মানুষের গলা এত মোটা হয়!

'গুড।' ঘুরে দাঁড়াল প্রশ্নকর্তা, ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল জাহেদের দিকে। বলল, 'পরিচয় পর্বটা সেরে ফেলা যাক সংক্ষেপে। আমি রাশেদ। আজ সকালে আমিই ফোন করেছিলাম ঢাকায়।'

'আমি জাহেদ, ক্যাপ্টেন জাহেদ,' রাশেদের বাড়ানো হাতটা জোরে জোরে ঝাঁকাতে লাগল সে। 'মিশন লীডার। ভেরি প্লীজড্ টু মিট ইউ।' এরপর রানা, গোরা আর জসিমের সঙ্গে রাশেদকে পরিচয় করিয়ে দিল সে।

এবার ট্রাক ড্রাইভার আর তালগাছের সাথে আলাপ করিয়ে দেয়া হলো ওদের। 'এ হচ্ছে আবদুর রহমান,' বলল রাশেদ। 'কানে কম শোনে। আর এ,' তালগাছের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। 'নাম যদিও সোলায়মান, কিন্তু আমরা ডাকি আবহাওয়া অফিসার। জোরে বাতাস উঠলে ওর মাথায়ই প্রথমে লাগে কি না!'

লজ্জা পেল তালগাছ। মুখ নিচু করে মাথা চুলকাতে লাগল।

'চলুন। গাড়িতে উঠে কথা হবে। এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না।'

জাহেদকে নিয়ে রাশেদ বসল সামনের সীটে। রানাকে মাঝখানের সীটে বসানো হলো জানালার ধারে। তার পাশে গোরা। আবদুর রহমান আর জসিম বসল পিছনের সীটে। চলতে শুরু করল ফোক্সওয়াগেন। নানারকম বিদঘুটে আওয়াজ করছে ওটা চলতে চলতে, মেঘের মত ঘন কালো ধোঁয়া ছাড়ছে এগজস্ট পাইপ দিয়ে। একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা এনজিনের, ভাবল

রানা; কতদিন সার্ভিসিং করানো হয় না কে জানে। পিছনে তাকাল ও। একে অন্ধকার, তারওপর কালো ধোঁয়া, মনে হচ্ছে পিছনের কাঁচের গায়ে কে যেন একপোচ কালো রঙ লাগিয়ে দিয়েছে।

একটু পর মুখ খুলল জাহেদ। নিচু গলায়, পিছনের কেউ যাতে শুনতে না পায়, বলল, 'টেলিফোনে প্রথমে বললেন তিন তারিখ সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকতে হবে আমাদের টেকনাফ হয়ে। তারপরই আবার আমাদের দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করে নতুন প্ল্যান জানালেন, আজই আসতে হবে, আকাশ পথে। ব্যাপারটা কি, মিস্টার রাশেদ?'

'সবই চিতার নির্দেশে করেছি আমি।'

'আচ্ছা!'

'হ্যাঁ। টেলিফোন করেছিলাম আসলে শত্রুপক্ষকে মিসগাইড করার জন্যে। এদেশে আন্তর্জাতিক তো বটেই, এমনকি সমস্ত লোকাল ফোন কল পর্যন্ত ট্যাপ করা হয়। বহু আগে থেকেই চলে আসছে এসব। ফোন করে তাই ব্যাপারটা একটু জটিল করে তুলতে চেয়েছিলাম আসলে আমরা। ওরা জানবে একরকম, আর আমরা করব আরেকরকম, এই ছিল চিতার উদ্দেশ্য। মৌচাকে ঢিল ছুঁড়েই ছুটলাম আপনাদের দূতাবাসে। আপনার বস্, ব্রিগেডিয়ার জলিল খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন আমার খোলামেলা প্ল্যান শুনে, তাই না?'

'শুধু তাই? রীতিমত ঘাম ছুটে গিয়েছিল বন্ধুর বিপদের কথা ভেবে।'

একটু হাসল রাশেদ। 'তা ভদ্রলোকের গলা শুনেই টের পেয়েছি আমি। কিন্তু কি করব, চিতার হুকুম। অনেকদিন ধরে দেখা-সাক্ষাৎ নেই ওঁদের দুজনের, কিন্তু টেলিফোনে মাঝেমধ্যে আলাপ-সালাপ হয় শুনেছি।'

'জানি। চিতার অনেক গল্প শুনেছি আমি বসের মুখে। তারপর? ফোন সেরেই ছুটলেন দূতাবাসে?'

'হ্যাঁ। ফোন করার এক ঘণ্টার মধ্যে দেখা করি গিয়ে রাষ্ট্রদূত মিস্টার রেজাউল করিমের সঙ্গে, তাঁকে চিতার দ্বিতীয় এবং চূড়ান্ত সেট আপটা জানাই বিস্তারিতভাবে। সব শুনে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে দেরি হয়নি ভদ্রলোকের। আমাকে আশ্বাস দিলেন তিনি, বললেন ঢাকার সাথে যোগাযোগ করবেন গোপন মাধ্যমে। আপনার চীফকে জানাবেন নতুন পরিকল্পনার কথা।'

'প্ল্যানটা এককথায় চমৎকার হয়েছে,' বলল জাহেদ। 'হাতে সময় আছে বলে আমরা সবে ভাবতে শুরু করেছিলাম, কিভাবে কি করব। হঠাৎ করে বিকেলবেলা শুনি এই খবর, ফ্লাইটের তখন বাকি আড়াই ঘণ্টার মত। খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে···'

'আপনাদের এই ঝামেলায় ফেলার জন্যে আমরা আন্তরিক দুঃখিত। আশা করি সমস্যাটা বুঝবেন আপনি। চিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে বড্ডো দুশ্চিন্তায় আছি আমরা।'

'দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নেই আপনার, মিস্টার রাশেদ। চিতাকে সাহায্য করার এই বিরল সুযোগ পেয়ে আমি বরং ধন্য মনে করছি নিজেকে। গর্ব অনুভব করছি।'

'ধন্যবাদ।'

এনজিনের অবস্থা যাই হোক, গাড়িটা ছুটছে বেশ জোরেই। খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে ঢুকছে ঠাণ্ডা বাতাস। শীত শীত লাগছে। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল রানা, মেঘ করেছে খুব—বৃষ্টি নামতে পারে। কোনদিকে ছুটছে গাড়ি বোঝার কোন উপায় নেই। এমনিতেই রেঙ্গুনের পথঘাট বলতে গেলে কিছুই চেনে না রানা। তারওপর আলোও নেই।

এর আগে একবারই মাত্র রেঙ্গুন এসেছে রানা, অনেক আগে। সবে স্বাধীন হয়েছে তখন বাংলাদেশ, কিন্তু বিশেষ এক মহল ব্যাপারটা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। ষড়যন্ত্র শুরু করে তারা শিশু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, আস্তে আস্তে দেশটাকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে উঠেপড়ে লাগে। এই রেঙ্গুনেই এক হয় সেইসব কুচক্রী, তথাকথিত 'মুসলিম বাংলা ফৌজ' গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

কিন্তু সেই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র অঙ্কুরেই ধ্বংস করে দিয়েছিল মাসুদ রানা। এখানেই সেবার প্রথম টক্কর লাগে ওর অত্যন্ত প্রতিভাধর, দোর্দণ্ডপ্রতাপ দস্যু উ সেনের সঙ্গে।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে সামনে তাকাল রানা। হেডলাইটে তেমন জোর নেই, সামনেটাও ভাল দেখা যায় না। নিবিষ্ট মনে গাড়ি চালাচ্ছে আবহাওয়া অফিসার, মাথা প্রায় ছুঁই ছুঁই করছে গাড়ির ছাত। তার পাশে এখনও নিচু গলায় বকবক করে চলেছে জাহেদ-রাশেদ। কি এত আলাপ করছে ব্যাটারা? ভুরু কোঁচকাল রানা।

ভেতরে ভেতরে উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছে ওর। ভেবেছিল প্লেন থেকে নেমে এদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার একটা উপায় খুঁজে নেবে, ফাঁক বুঝে সটকে পড়বে। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। এত লোককে কি করে ফাঁকি দেবে ও?

চিন্তায় বাধা পড়ল, আচমকা বাঁয়ে টার্ন নিয়েছে মাইক্রোবাস। সিধে হয়েই আবার ডানে টার্ন নিল গতি একটুও না কমিয়েই। আরও মিনিট পাঁচেক চলার পর থেমে দাঁড়াল প্রকাণ্ড একটা অন্ধকার দোতলা বাড়ির সামনে।

'নামুন সবাই,' বলল রাশেদ। 'কুইক!'

নেমে পড়ল ওরা। রাশেদকে অনুসরণ করে দ্রুত ঢুকে পড়ল বাড়িটার বাউন্ডারির মধ্যে। বাড়ির ভেতরে ঢুকল না সে, দেয়ালের গা ঘেঁষে খুব সাবধানে পিছনের বাউন্ডারি ওয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'কি হলো?' কিছুটা বিস্মিত হলো জাহেদ। 'এখানে কেন?'

'জাম্প!' দেয়ালের ওপর চড়ে বসেছে ততক্ষণে রাশেদ এক লাফে। পরমুহূর্তে ধুপ করে লাফিয়ে পড়ল ওপাশে। দেখাদেখি অন্যরাও অনুসরণ করল তাকে, এক এক করে দেয়াল টপকাল সবাই। রানার ঠিক পিছনেই আঠার মত লেগে রয়েছে গোরা, ঠোঁটে কুলুপ এঁটে কেবল অনুসরণ করে চলেছে।

বাড়িটার পিছনে সরু একটা রাস্তা। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কয়েকটা বিল্ডিং। বেশিরভাগই অন্ধকারে ডুবে আছে। বেশ বড় একটা মাঠও

দেখা যাচ্ছে ওদিকে। তার মাঝেখান দিয়ে কোনাকুনি ভাবে ছুটল ওরা এবার। মাঠ পেরিয়ে আরেকটা সরু রাস্তায় এসে উঠল। সামনেই অনেকখানি জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশাপাশি অনেকগুলো প্রকাণ্ড বিল্ডিং। কোন অভিজাত আবাসিক এলাকা হবে এটা, ভাবল রানা। এটা পিছন দিক।

রাশেদের নির্দেশে সন্তর্পণে এগোল ওরা। চার পাঁচটা বাড়ি পাশ কাটিয়ে চট্ করে ঢুকে পড়ল একটা তিনতলা বাড়ির পিছন দরজা দিয়ে। ভেতরে এসে চারদিকে তাকাল রানা। বাড়িটা বেশ পুরানো মনে হচ্ছে। কাঠের ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ড রয়েছে জানালায়, তার ফাঁক দিয়ে ভেতরের আলো আসছে বাইরে।

নিঃশব্দে পিছনের একটা দরজা খুলে দিল কেউ ভেতর থেকে।

মিঙ্গালাদন এয়ারপোর্ট। রেঙ্গুন।

টার্মিনাল ভবনের দোতলার ক্যাফেটেরিয়ার এক কোণে বসে আছে ছোটখাট এক লোক। সারা ক্যাফেটেরিয়া আলোয় আলোয় ঝলমল করলেও এই জায়গাটা প্রায় অন্ধকার। বাল্ব নেই বা ফিউজ হয়ে গেছে বলে নয়, ওপরমহলের নির্দেশে নিভিয়ে রাখা হয়েছে। আরও দুজন খদ্দের রয়েছে ওদিকে, দরজার কাছাকাছি বসে কফি পান করতে করতে গল্প করছে দুই যুবক। এই তিনজন ছাড়া এ মুহূর্তে আর কেউ নেই ক্যাফেটেরিয়ায়।

একটা টেবিলের ওপর বসে আছে ছোটখাট মানুষটা। চোখে নাইটগ্লাস। দেয়ালজোড়া পুরু কাঁচের জানালা দিয়ে টারমাকের দিকে চেয়ে আছে সে। 'বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের' বিজি ০৭৬ ফ্লাইট অবতরণ করেছে। ট্যাক্সি করে টার্মিনাল ভবনের একটু দূরে এসে দাঁড়িয়েছে সবে। পলকহীন চোখে চেয়ে আছে সে বিমানটার দিকে।

বার্মিজ আর্মি ইন্টেলিজেন্সের ওয়াচার লোকটা, উ উইন। মনে মনে কর্নেল উ ক মঙের চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করছে উইন। কর্নেল মঙ আর্মি ইন্টেলিজেন্সের চীফ। ভীষণ বগরাগী মানুষ। দেহখানাও তেমনি দশাসই। উইনের ধারণা কম করেও তিনশো পাউন্ড ওজন হবে চীফের। চর্বিবহুল মুখখানা দেখলে ওর কেন যেন জলহস্তীর কথা মনে পড়ে যায়। তার চোখে চোখ রেখে নির্ভয়ে কথা বলতে পারে, এমন কেউ নেই তাদের সার্ভিসে, কথাটা নির্দ্বিধায় লিখে দিতে পারে উইন।

আজ দ্বিতীয় বিয়ে বার্ষিকী উইনের। কথা ছিল যত কাজই থাক, আজ রাতটার জন্যে অন্তত ছুটি নেবে সে। স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরবে-বেড়াবে, ছবি দেখবে এবং চ্যাঙ জিয়াঙে চাইনীজ খাবে। কিন্তু কোনটাই হলো না। বেচারী এখনও হয়তো সাজগোজ করে বসে আছে ওর অপেক্ষায়।

এ সবের জন্যে দায়ী ওই ব্যাটা কর্নেল। দুপুরে ওকে নিজের কামরায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন কর্নেল মঙ। হুকুম দিয়েছেন, রাতে এয়ারপোর্টে বসে 'বিমানের' বিজি ০৭৬ ফ্লাইটের ওপর নজর রাখতে হবে। কজন যাত্রী নামে, তাদের মধ্যে কারও আচরণ সন্দেহজনক মনে হয় কি না ইত্যাদি ওয়াচ করতে হবে। কাউকে সন্দেহ হলে তৎক্ষণাৎ জানাতে হবে তা কর্নেলকে।

উইন জানে না, এয়ারপোর্ট কাস্টমসকেও এই একই নির্দেশ পাঠিয়েছে কর্নেল। নির্দেশে বলা হয়েছে, ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট হোল্ডার কেউ যদি আসে ওই ফ্লাইটে, যত আপত্তিই করুক, অবশ্যই তন্ন তন্ন করে চেক করতে হবে তার বা তাদের ব্যাগেজ। সাধারণ যাত্রীদের বেলায়ও ওই নির্দেশ।

চেয়ে চেয়ে দেখছে উইন, একটা বাচ্চা মেয়েসহ নারী পুরুষ মিলিয়ে মোট সতেরোজন যাত্রী নেমে এল প্লেন থেকে। ধীর পায়ে টার্মিনাল ভবনে এসে ঢুকল তারা এক এক করে। কারও মধ্যে কোনরকম সন্দেহজনক আচরণের আভাস পর্যন্ত নেই। নিতান্ত নিরীহ, সাধারণ যাত্রী এরা—নিশ্চিত হলো উইন। ঘুরে আবার প্লেনের দরজার দিকে তাকাল সে, আর কেউ নামে কিনা দেখার জন্যে। কিন্তু একনাগাড়ে প্রায় দশ মিনিট চেয়ে থাকার পরও যখন আর কেউ নামল না, নাইটগ্লাস নামিয়ে নিল সে। দুহাত টনটন করছে তার জিনিসটা একভাবে ধরে থাকতে থাকতে। ডানে-বাঁয়ে তাকাল উইন, বয়-বেয়ারাদের কাউকে পেলে এক কাপ কফি চাইবে। কিন্তু কেউ নেই ব্যাটারা। শুধু সেই দুই খদ্দেরকে দেখা যাচ্ছে ও প্রান্তে—সিগারেট টানছে এখনও বসে বসে।

এইসময় চমকে উঠল উইন, আচমকা উজ্জ্বল নীল আলোর একটা ঝলক, এবং সাথে সাথে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের আওয়াজে ধড়াস্ করে উঠল কলজে। পরমুহূর্তে নিকষ কালো অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল চারদিক। নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না উইন চোখের সামনে তুলে ধরেও।

দ্বিধায় পড়ে গেল সে। কি করবে বুঝতে পারছে না। সারা এয়ারপোর্টে আলো বলতে আছে সদ্য আসা বিমানটার ভেতরের আলো, তাও বাইরে খুব কমই আসছে। কিন্তু ওরই মধ্যে ব্যাপারটা চোখে পড়ল উইনের। ঠিক পরিষ্কার নয় যদিও, তবুও, মনে হলো একটা ছায়া যেন উড়ে বেরিয়ে এল বিমানটার পেটের ভেতর থেকে, চোখের পলকে মিশে গেল বাইরের কালিগোলা অন্ধকারে।

মাথা ঝাড়া দিয়ে আবার প্লেনটার দিকে চাইল সে। আরেকটা ছায়া! এবার পরিষ্কার দেখা গেল, হাতে বিরাট একটা ব্যাগ নিয়ে দুই লাফে গ্যাঙওয়ে পেরিয়ে মাটিতে পা রাখল আরেকজন। ব্যাপারটা এতই অভাবিত এবং এতই দ্রুত ঘটে গেল যে নাইটগ্লাস চোখে তোলার সময় পর্যন্ত পেল না উইন। এবার ব্যস্ত হয়ে ওটা তুলল সে, সাথে সাথেই আরও দুটো ছায়ামূর্তি দেখা গেল। এই সময় এমারজেনসি জেনারেটরটা চালু হয়ে গেল। মেইন এয়ারপোর্ট ভবন আর বাইরের কয়েকটা আলো জ্বলে উঠল। সে আলোয় প্রায় পরিষ্কার দেখা গেল, বেশ লম্বা চওড়া একজনকে দুহাতে প্রায় শূন্যে তুলে গ্যাঙওয়ের মাথায় এনে দাঁড় করাল গরিলার মত এক লোক। পুরো ব্যাপারটা ঘটতে সময় লাগল বড়জোর দুই কি তিন সেকেন্ড।

প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও সামলে নিতে দেরি হলো না উইনের। হাজার হলেও ট্রেনিং পাওয়া ওয়াচার, অনুমানের ওপর নির্ভর করে ক্যাফেটেরিয়ার প্রবেশ পথের দিকে পা বাড়াল সে। টেলিফোন করতে হবে

কর্নেল মঙকে। কিন্তু সামনেই একটা খসমস শব্দ উঠতে থমকে দাঁড়াল। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল কে যেন।

'কে ওখানে!' কেন যেন গলাটা কেঁপে গেল উইনের।

কোন উত্তর এল না। কিন্তু পরিষ্কার টের পেল সে, দুজোড়া পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে তার দিকে। যারাই হোক, বেশ নিশ্চিন্তে পা ফেলে এদিকেই আসছে।

প্রায় ককিয়ে উঠল এবার উইন, 'কে! কারা?' অজান্তেই গলা চড়ে গেছে তার, কাঁপুনি উঠে গেছে বুকের মধ্যে।

হঠাৎ ওর হাত দুটো চেপে ধরল কারা যেন দুপাশ থেকে। চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বাঁ বাহুতে তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা অনুভব করল উইন, চামড়া মাংস ভেদ করে ইনজেকশনের সুঁই ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে ওখানটায়। মৃত্যুভয় গ্রাস করল তাকে, হাত-পা অসাড় হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

এমন সময় পাশ থেকে মোলায়েম কণ্ঠে কেউ বলে উঠল, 'ভয় পেয়ো না, তোমাকে জানে মারব না আমরা। এটা ঘুমের ওষুধ। কাল বিকেলে বা সন্ধেয় যখন তোমার ঘুম ভাঙবে, তোমার চীফকে বোলো, চিতা তাকে সালাম জানিয়েছেন। কেমন?'

'চিতা!' কথা এরই মধ্যে জড়িয়ে এসেছে উইনের, জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেছে। বহুকষ্টে জিজ্ঞেস করল সে, 'চিতা কে?'

'তুমি চিনবে না তাঁকে। কর্নেলকে বোলো, সে চিনবে।'

ওইদিন সকাল ন'টার ঘটনা।

সুলে প্যাগোডা রোডের বর্মা হোটেলস অ্যান্ড ট্যুরিজম সার্ভিসের আকাশছোঁয়া বিশাল ভবনটার পাশের দশতলা ভবন। এর পাঁচতলার একটা কামরায় সামনের টাইপ করা কাগজটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে বার্মিজ আর্মি ইন্টেলিজেন্সের চীফ কর্নেল উ ক মঙ। চোখ লাল করে কাগজটার দিকে চেয়ে আছে সে। টাইপ করা শব্দগুলো এ পর্যন্ত বিশ-পঁচিশবার পড়া হয়ে গেছে, কিন্তু নিজেকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারছে না সে যে এমনটি হতে পারে, বা হওয়া সম্ভব।

তার প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বসে আছে টেলি কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের এক উঁচু পদের কর্মকর্তা, আই হাপ। একভাবে চেয়ে আছে সে সামনের বিশালদেহী মানুষটার থলথলে প্রকাণ্ড মুখটার দিকে। সাইকেলের টায়ারের মত পুরু ঠোঁটজোড়া বিচ্ছিরিরকম কালো। নিচেরটা সামান্য ঝুলে পড়েছে, ফাঁক দিয়ে কালো মাড়ি দেখা যাচ্ছে। খোলা মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ছে লোকটা ঝড়ের বেগে। কাঁচা রসুনের উৎকট গন্ধের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না বেচারা কর্মকর্তা। মনটা পালাই পালাই করছে তার।

এক সময় হঠাৎ সিধে হলো কর্নেল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আর্তনাদ জুড়ে দিল

রিভলভিং চেয়ারটা। বিড়বিড় করে বলল সে, 'ওপেন লাইনে কেউ এ ধরনের প্ল্যান নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারে, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। তাও আবার এক দেশের আর্মি ইন্টেলিজেন্সের চীফের সাথে?' আনমনে দুম করে প্রচণ্ড এক কিল বসাল কর্নেল টেবিলটার ওপর।

আঁতকে উঠেছিল হাপ প্রথমে, পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিল। তার ভয় পাওয়ার ব্যাপারটা কর্নেলের চোখে ধরা পড়ে গেছে বুঝতে পেরে কান-গাল গরম হয়ে উঠল। বারকয়েক খুক্ খুক্ করে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল সে। বলল, 'কিন্তু ব্যাপারটা ঘটেছে ঠিক তাই, কর্নেল। আপনি চাইলে রেকর্ড করা কথাগুলো বাজিয়ে শোনাবার ব্যবস্থা করা যাবে। অবশ্য···ওপাশ থেকে রিসিভার তোলার পর এখান থেকে প্রথমে যে কথাগুলো বলা হয়েছে, সেগুলো বহু চেষ্টা করেও বুঝতে পারিনি। কথাগুলো যেমন ছিল চাপা, তেমনি দ্রুত। তবে পরের কথাগুলো একদম পরিষ্কার।'

'কত নম্বর থেকে টেলিফোন করা হয় ঢাকায়? ফোনটা কার?'

'ওটা একটা পে-টেলিফোন, কর্নেল। আমাদেরই ইন্টারন্যাশনাল এক্সেচেঞ্জের। সকাল পোনে আটটার সময় করা হয়েছে।'

'ঢাকার নাম্বারটা কার, জানা গেছে? সত্যিই ওটা ব্রিগেডিয়ার জলিলের?'

'সন্দেহ আছে। ওই নাম্বারে কয়েকবার ট্রাই করে দেখেছি আমি নিজে, ঢাকার পুরনো এয়ারপোর্ট এলাকার শাহীনবাগের একটা বাসার নাম্বার ওটা। বাড়ির লোক বলেছে, ওটা নাকি বাংলাদেশ শিল্প অধিদফতরের কোন এক সচিবের বাসার নাম্বার।'

চোখ বুজে কিছু একটা ভাবল কর্নেল মঙ। উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও নেই এখন তার চেহারায়, সম্পূর্ণ শান্ত দেখাচ্ছে। চোখ মেলল সে। 'ঠিক আছে, মিস্টার হাপ, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি ওদিকে আরেকটু লক্ষ রাখবেন, আর কোন টেলিফোন করা হয় কিনা ঢাকায়। ওকে? গুড ডে।'

'গুড ডে, কর্নেল,' মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল হাপ। বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে।

আবার চোখ বুজল কর্নেল। আপনমনে বিড়বিড় করে বলতে লাগল কী সব। এক সময় উঠল সে। চেয়ারের পিছনের প্রকাণ্ড ফাইলিং র‍্যাক থেকে একটা ফাইল নিয়ে এসে বসল আবার। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থার ফ্লাইট শিডিউল আছে ওই ফাইলে।

পাঁচ

ছোট্ট একটা প্যাসেজ পেরিয়ে কিচেনে এসে ঢুকল দলটা। কিচেনটা প্রকাণ্ড। পুরো মেঝে ও চার দেয়ালের ছ ফুট পর্যন্ত দামী মার্বেল টাইলস দিয়ে মোড়া। দামী বর্মা টিকের তৈরি সদশ্য ওয়াল কেবিনেট ঝুলছে দেয়ালের এমাথা থেকে

ওমাথা পর্যন্ত। সিঙ্ক বার্নারসহ সবকিছুই অত্যন্ত দামী। ঝকঝক তকতক করছে পুরো কিচেন।

অন্য প্রান্তের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা কিচেন থেকে। লম্বা করিডর পেরিয়ে এসে দাঁড়াল এক সুসজ্জিত হলরুমে। অত্যাধুনিক সব আসবাবপত্রে সাজানো রুমটা। অর্থই শুধু নয়, সেই সাথে সুরুচিরও সমন্বয় ঘটানো হয়েছে রুমটার ডেকোরেশনে। পুরু কার্পেটে মোড়া মেঝের প্রতিটি ইঞ্চি। ও মাথায় প্রকাণ্ড কাঠের সিঁড়ি, 'এল' প্যাটার্নের বাঁক খেয়ে উঠে গেছে দোতলায়।

ওদের দোতলায় নিয়ে এল রাশেদ। একটা রুমে বসতে দিল। 'একটু জিরিয়ে নিন,' বলল সে। 'আমি দেখি ম্যাডাম কি করছেন।' দরজা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা।

'ম্যাডামটা আবার কে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

উত্তর দিল না জাহেদ। জসিমের দিকে ফিরল, রাকস্যাকের দিকে ইঙ্গিত করল ভুরু নাচিয়ে। 'ইকুইপমেন্ট সব ঠিক আছে তো?'

'জি, ক্যাপ্টেন। ঠিক আছে।' এই প্রথম লোকটাকে কথা বলতে শুনল রানা। কথার মধ্যে কেমন সর্দি সর্দি ভাব।

'আমাকে এখন কি করতে হবে, ক্যাপ্টেন?' বলল রানা। 'দয়া করে বলবেন কি?'

ঝট্ করে ওর মুখের দিকে তাকাল জাহেদ নতুন সম্বোধন শুনে। নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে বোঝার চেষ্টা করল লোকটা তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে কি না। কিন্তু মুখের ভাবে তেমন কিছু বোঝা গেল না। গম্ভীর গলায় বলল, 'করার মত কাজ আপনার একটাই, মুখ বুজে আমার নির্দেশ পালন করে যাওয়া, শেষ পর্যন্ত।'

'সেই শেষটা কোথায়, তাই তো জানতে চাইছি।'

'শেষটা···' থেমে গেল জাহেদ, বোধহয় ভাবল কি বলা যায়, তারপর বলল, 'শেষটা অন্তিম মুহূর্তে, স্বভাবতই।'

'আমি যখন এই মিশনেরই সদস্য, তখন নিশ্চয়ই আমার জানার অধিকার আছে মিশনটা কিসের, না কি বলেন?'

অন্যদিকে মুখ করে একটা সিগারেট ধরাল জাহেদ। 'হ্যাঁ, আছে।'

'এবার তাহলে দয়া করে বলুন, এ মিশনের উদ্দেশ্য কি?'

'কেন, জানেন না? ঢাকা থেকে কিছু শুনে আসেননি আপনি?'

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল রানার। থেমে থেমে বলল, 'এ ব্যাপারে আগেই বলেছি একবার, ভুলে গেছেন হয়তো। তাই আরেকবার···'

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' হাত তুলে রানাকে শান্ত করার চেষ্টা করল ক্যাপ্টেন। রানার মুখচোখের ভাব দেখে মনে হয়েছে আবার বোধহয় বেয়াড়া হয়ে উঠতে যাচ্ছে লোকটা এয়ারপোর্টের মত। 'এসব কথা এখন থাক। পরে এক সময় আলাপ করা যাবে।'

'দেরি হয়ে যেতে পারে তখন।'

'হয় হোক, ও নিয়ে আমি ভাবব।'

উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। চিন্তিত মনে পায়চারি শুরু করল ঘরের এ মাথা ও মাথা। দু হাত পিছনে বাঁধা, পা ফেলছে মেপে মেপে। তিনজোড়া চোখ চেয়ে আছে ওর দিকে সম্মোহিতের মত। এক সময় থামল রানা, ঘুরে সরাসরি জাহেদের চোখের দিকে তাকাল। 'শুনুন, ক্যাপ্টেন, আমাকে ধরে এনে মারাত্মক ব্লান্ডার করেছেন আপনি। আমি বারবার ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করার পরও ভুল শোধরাবার কোন চেষ্টাই করছেন না। যাকে ভেবে আমাকে ধরে নিয়ে এসেছেন, এখনও বলছি, আমি সে লোক নই। বুঝতে চেষ্টা করুন।'

'হাসান,' বাধা দিল জাহেদ। 'আপনার ভাষণ বন্ধ করুন দয়া করে। আমি অন্য চিন্তা করছি। বললাম তো, পরে কথা হবে এ নিয়ে।'

কানে তুলল না রানা। বলে চলেছে, 'আমি যে কাজে এসেছি, তার তো বারোটা বাজালেনই, আপনার মিশনও শেষ পর্যন্ত না বরবাদ হয়। ভাবছি, আমার বদলে আসলে যার আসার কথা ছিল, সে কে? কোন্ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সেই লোক? এল না কেন? তার ওপর কতখানি নির্ভরশীল এ মিশন? এখনও সময় আছে, ক্যাপ্টেন, পরে হয়তো সময় পাবেন না। আপনি এসেছেন মিলিটারি মিশন নিয়ে, আমি এসেছি ডিপ্লোম্যাটিক মিশন নিয়ে। অথচ মাঝখান থেকে আমাকে নিয়ে অনর্থক টানাটানি শুরু করেছেন আপনি। ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলে এখনও হয়তো…' থেমে গেল রানা, ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে ক্যাপ্টেন ঠোঁট বাঁকিয়ে।

'ডিপ্লোম্যাটিক মিশন?' ভুরু নাচাল সে। 'আচ্ছা!'

পকেটে হাত ঢোকাল রানা। পাসপোর্টটা দেখিয়ে এবার চমকে দেয়া যাক গাধাটার পিলে। কিন্তু ওর নিজেরই পিলে চমকে গেল ওটা খুঁজে না পেয়ে। এ পকেট ও পকেট হাতড়াতে লাগল রানা, কিন্তু নেই হয়ে গেছে পাসপোর্টটা। পরিষ্কার মনে আছে, ঢাকা এয়ারপোর্টের ফর্ম্যালিটিজ সেরে তাড়াহুড়োর মধ্যে কোটের ডান পকেটে রেখেছিল সে ওটা আর টিকেট একসাথে। গেল কোথায়? উত্তেজনায় গলা শুকিয়ে গেল রানার, ঘেমে উঠল হাতের তালু। নিজেকে অসহায় মনে হলো ওর।

'কি খুঁজছেন?' জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন।

'আমার পাসপোর্ট আর টিকেটটা রেখেছিলাম এই পকেটে। কিন্তু…।'

'পাসপোর্ট! টিকেট? কি যা তা বলছেন? ওগুলো তো থাকারই কথা ছিল না! বিনা পাসপোর্ট, বিনা টিকেটের যাত্রী আমরা চারজনই। তার…'

'থামুন!' ধমকে উঠল রানা। 'আপনি কি জানেন?'

জসিমের দিকে ফিরে ঠোঁট টিপে হাসল ক্যাপ্টেন। নিচু গলায় বলল, 'ভয় পেয়েছে ব্যাটা। একেবারে ঘাবড়ে গেছে। সিভিলিয়ানদের নিয়ে এই হচ্ছে জ্বালা।'

'মিথ্যে বলেননি,' বলল রানা। কথাটা কানে গেছে আস্তে বলা হলেও। 'তবে আমার নিজের জন্যে নয়, আপনার কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি আমি। আজ

আমি সিভিলিয়ান, ঠিকই, কিন্তু এক সময় আর্মিতে ছিলাম। রিটায়ার করেছি মেজর হয়ে। আপনার এই ভুলের···'

'ব্যস্, ব্যস্। মেজর জেনারেল হয়ে যে রিটায়ার করেননি, তাতেই আমি খুশি। জেনে রাখুন, হাসান, আমি ভুল করে থাকলে তার মাসুলটাও আমিই দেব। এ নিয়ে আপনাকে অনর্থক মাথা ঘামাতে হবে না।'

দরজায় মৃদু আওয়াজ উঠতে ঘুরে দাঁড়াল রানা। খোলা দোরগোড়ায় অপূর্ব সুন্দরী এক বার্মিজ যুবতী দাঁড়িয়ে। ছিমছাম, হালকা পাতলা গড়ন। বয়স খুব বেশি হলে উনিশ কি কুড়ি হবে। টাইট জিনসের সাথে অফ হোয়াইট ঢোলা শার্ট পরেছে ইন করে, পায়ে দেশী চপ্পল। কুচকুচে কালো চুলগুলো ঘাড়ের সামান্য নিচে ইউ শেপ করা। বাঁ হাতের কব্জিতে কালো ব্যান্ডে ছোট্ট সোনালী ঘড়ি—অনামিকায় দুধ সাদা হীরের আংটি।

ঈষৎ চাপা গাল আর স্বাভাবিকের তুলনায় সামান্য ছোট আকারের চোখ দুটো ছাড়া বোঝার কোন উপায়ই নেই এ মেয়ে বার্মিজ। কোমল স্নিগ্ধ হাসি ঠোঁটে ধরে ভেতরে এসে দাঁড়াল যুবতী। ওদের চারজনের মধ্যে চেহারা সুরতে রানাকেই দলনেতা ধরে নিল। এগিয়ে এসে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। পরিষ্কার ঝরঝরে ইংরেজিতে বলল, 'আমি জিনিয়া। আমাদের সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে হাজারো ঝুঁকি আছে জেনেও এতপথ ছুটে এসেছেন, সে জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশ সরকারের এই সহযোগিতার কথা আজীবন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করব আমরা।'

জিনিয়ার হাত ঝাঁকিয়ে দিল রানা আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। তারপর নিজেই তার ভুল ভাঙিয়ে দিল। 'আমি না, ম্যাডাম। মিশন লীডার ইনি, ক্যাপ্টেন জাহেদ।'

'ও, আয়্যাম সো সরি,' গাল দুটো সামান্য রাঙা হয়ে উঠল জিনিয়ার। তাড়াতাড়ি জাহেদের সঙ্গে হাত মেলাল সে। 'রিয়েলি সরি, ক্যাপ্টেন।'

'দ্যাটস অলরাইট, ম্যাম।'

রানার দিকে ফিরল আবার যুবতী। ততক্ষণে বসে পড়েছে ও আগের জায়গায়। চোখাচোখি হতে লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হাসল, 'উনি···'

'হাসান,' বলল ক্যাপ্টেন। 'মিস্টার হাসান। মিশনের সদস্য। আর এ হচ্ছে জসিম,' সবশেষে আঙুল তুলে গরিলাকে দেখাল। 'ও গোরা।'

'চলুন, পাশের রুমে গিয়ে আলোচনাটা সেরে ফেলি,' জাহেদকে বলল জিনিয়া। দু পা এগিয়ে কি মনে করে থেমে দাঁড়াল, রানার দিকে ফিরে বলল, 'আপনারা বিশ্রাম করুন। সোলায়মান, এঁদের কফি দাও।'

দরজার বাইরে থেকে প্রায় কুর্নিশের ভঙ্গিতে জিনিয়াকে সালাম করল তালগাছ, 'জ্বি।'

পিছন থেকে প্রায় নিঃশব্দে দুটো ট্রুপ ক্যারিয়ার এসে দাঁড়াল ফোক্সওয়াগেনটার পাশে। সামনের ক্যারিয়ারের দরজা খুলে প্রথমে নেমে এল কর্নেল উ ক মঙ। এরপর নামল এক মেজর। মাইক্রোবাসের ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল তারা। রাস্তার ওপাশের একটা আলোবিহীন ইলেকট্রিক পোস্টের গোড়ায়

বসে ছিল লুঙ্গি পরা চাষাভুষো ধরনের এক লোক, ট্রাক দুটো দেখে উঠে এল সে। সামনে এসে স্যালুট করল কর্নেলকে।

'এই বাড়িতেই ঢুকেছে তো?' থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল কর্নেল।

'জ্বি, কর্নেল, স্যার!' মুখটা সামান্য পিছিয়ে নিতে বাধ্য হলো লোকটা। ভক্ ভক্ করে কাঁচা রসুনের গন্ধ বেরুচ্ছে কর্নেলের মুখ দিয়ে, পেটের নাড়ি গুলিয়ে উঠেছে তার। ঠেলে উঠে আসা টক্ টক্ পানিটুকু জোর করে যথাস্থানে ফেরত পাঠাল সে।

'জানতাম,' আপনমনে প্রকাণ্ড মাথা দোলাতে লাগল কর্নেল মঙ। 'আমি জানতাম এখানেই আসবে ওরা। বিদেশ থেকে ফিরে এই বাড়িতেই আড্ডা গেড়েছিল ছুঁড়িটা। কিন্তু কদিন আগে সেই যে গায়েব হলো হঠাৎ করে, তারপর থেকে আর পাত্তাই নেই কোন। ওকে যদি ধরতে পারি তাহলেই কেল্লা ফতে, বুঝলে, মেজর?'

'জ্বি, কর্নেল।'

'ঠিক আছে, ঘিরে ফেলো বাড়ি।'

'রাইট, স্যার।'

মেজরের নির্দেশে দুই প্লাটুন সৈন্য ঘেরাও করে ফেলল অন্ধকার বাড়িটা। মুখের সামনে একটা মেগাফোন ধরে চ্যাঁচাতে লাগল মেজর, 'সারেন্ডার! বাড়ির ভেতরে কে কে আছ, বেরিয়ে এসো সামনে। কেউ পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি ছোঁড়া হবে, সাবধান! পুরো বাড়ি ঘিরে ফেলেছি আমরা, বেরিয়ে এসো।'

একটু থামল মেজর। কিন্তু ভেতর থেকে কারও বেরিয়ে আসার কোন লক্ষণ নেই দেখে আবার চ্যাঁচাতে শুরু করল, 'পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হলো তোমাদের বেরিয়ে আসার জন্যে। এরমধ্যে সারেন্ডার না করলে আর্মি ঢুকবে ভেতরে। ভাল চাও তো বেরিয়ে এসো সবাই।'

এবারও কাজ হলো না দেখে ভীষণ রেগে গেল কর্নেল মঙ। মেজরকে ভেতরে ঢোকার নির্দেশ দিল সে। টপাটপ দেয়াল টপকাল দুই প্লাটুন সৈন্য, তালা ভেঙে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল বাড়ির মধ্যে। পুরো বাড়ি, আঙিনা, ছাত, কার্নিস তন্ন তন্ন করে সার্চ করল তারা দশ মিনিট ধরে। কিন্তু পাওয়া গেল না কাউকেই। ইঁদুর আর তেলাপোকা ছাড়া আর কোন প্রাণীর অস্তিত্ব নেই প্রকাণ্ড বাড়িটায়।

হতাশায় কালো মুখটা আরও কালো হয়ে উঠল কর্নেলের। প্রচণ্ড রাগে রক্ত চড়ে গেছে মাথায়। 'কোথায় গেল?' ওয়াচার লোকটার দিকে ফিরে খেঁকিয়ে উঠল সে। 'তুমি না বললে এই বাড়িতে ঢুকেছে ওরা? কোথায় গেল তাহলে? নাকি ঘুমাচ্ছিলে পড়ে পড়ে? এতগুলো মানুষ পায়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল, দেখতে পাওনি?'

'জ্বি না, কর্নেল, স্যার!' থরথর করে কাঁপছে লোকটা। 'আমি ঘুমাইনি, স্যার। জেগেই ছিলাম। ওরা···ওরা তাহলে পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে, কর্নেল। অন্ধকারের জন্যে দেখতে পাইনি।'

লোকটার জানা আছে রেগে গেলে পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে যায় কর্নেল। আর যার ওপর তার রাগ হয়, সে যদি তখন একচুলও নড়াচড়া করে, চোখের পলকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে হিংস্র জানোয়ারের মত। তাই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেচারা। এসব ক্ষেত্রে কর্নেলের আক্রোশের হাত থেকে বাঁচার একটাই উপায় আছে, তা হলো, হোক আর না হোক, ভুল হয়েছে কি অন্যায় হয়েছে, তা স্বীকার করে নেয়া। তাহলেই রাগ পড়ে যাবে কর্নেলের। ঠোঁট একটুও না নাড়িয়ে তাই বলল সে, 'ভুল হয়ে গেছে, স্যার। আমার বোধহয় পিছনদিকে খেয়াল রাখা উচিত ছিল।'

যথারীতি রাগ পানি হয়ে গেল মঙের। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'হ্যাঁ, অন্ধকার একটু বেশিই মনে হচ্ছে এদিকটায়। তুমি আর তার কি করবে! যেখানে থাকতে বলা হয়েছে সেখানেই তো ছিলে।' বাড়িটার দিকে চেয়ে থাকল সে কিছুক্ষণ আনমনে। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। পালিয়ে যাবে কতদূর? দেখব তোমাদের দৌড়।'

চর্কির মত ঘুরে দাঁড়াল কর্নেল মঙ। 'চলো, মেজর! আর তুমি এখানেই থাকো,' ওয়াচার লোকটাকে বলল সে। 'সন্দেহজনক কিছু দেখলে সাথে সাথে জানাবে আমাকে। আমি অফিসেই আছি।'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল জাহেদ আর্মি রেইডের খবর শুনে। 'বলেন কি? কি করে টের পেল ওরা?'

'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, ক্যাপ্টেন।' সম্পূর্ণ ধীর, স্থির রয়েছে জিনিয়া। 'কর্নেল মঙকে ভুলেও কখনও আন্ডারএস্টিমেট করেননি চিতা। যার জন্যে আজও মুক্ত আছি আমরা, ধরা পড়িনি। ওই বাড়িটা আমাদের এক ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধুর, চাচা ডাকি আমি তাঁকে। তিনি অবশ্য দেশে নেই এখন। ব্যাপারটা জানে কর্নেলও, তাই ওই বাড়ির ওপর নজর ছিল তার। বিদেশ থেকে ফিরে এবার ওই বাড়িতেই উঠেছিলাম আমি। কিন্তু সামরিক জান্তার কোপদৃষ্টি পড়েছে তাঁর ওপর, টের পাওয়ামাত্র সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন চিতা। তখনই আমাকে সরে পড়তে বলেছিলেন। সেই থেকে গত এক সপ্তা ধরে এই বাড়িতে নিজেকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রেখেছি আমি। চিতা আত্মগোপন করেছেন, ব্যাপারটা টের পাওয়ামাত্র আমার খোঁজে ওই বাড়িতে হানা দেবে কর্নেল মঙ, বুঝতে পেরে আগেই আমাকে গা ঢাকা দিতে বলেছিলেন তিনি। আমাকে কব্জা করতে পারলেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবেন চিতা, কর্নেল তা ভালই জানে। আপনার জন্যে একটা খবর আছে, আপনার বসের সাথে আজ লেফটেন্যান্ট রাশেদের যে কথা হয়েছে টেলিফোনে, তা সম্ভবত বিশ্বাস করেনি কর্নেল। অবশ্য বিশ্বাস করবে, তা আশাও করিনি আমরা। সে যাক্, এয়ারপোর্টে একজন ওয়াচার পাঠিয়েছিল সে।'

ভুরু কুঁচকে গেল জাহেদের। 'জানলেন কি করে?'

'মঙের সম্ভাব্য ওয়াচারকে মার্ক করার জন্যে আমরাও দুজন কাউন্টার ওয়াচার পাঠিয়েছিলাম,' হাসল জিনিয়া। 'একটু আগে ফিরে এসেছে তারা।

বলেছে, লোকটাকে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসা হয়েছে ওখানে।'

'কপালে দেখছি ভালই খারাবি আছে,' গম্ভীর হয়ে গেল ক্যাপ্টেন জাহেদ।

পর পর দুকাপ কফি খেয়ে নিজেকে বেশ চাঙ্গা মনে হচ্ছে মাসুদ রানার। অন্ধকারে চুপচাপ সিগারেট টানছে ও। পাশেই গোরা বসে আছে। জসিমকে একটু আগে রাশেদ এসে ডেকে নিয়ে গেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আলোটা নিভিয়ে দিয়ে গেছে রাশেদ। রানা কারণ জানতে চাওয়ায় বলেছে, 'ঝামেলার আশঙ্কা করছি আমরা।'

'কিসের?'

'আর্মি ঘুরঘুর করছে। মনে হয় আপনাদের অনুপ্রবেশের ব্যাপারটা টের পেয়ে গেছে ওরা কোনভাবে। অবশ্য ঘাবড়াবার কিছু নেই। তেমন কিছু হলে নির্বিঘ্নে সরে পড়তে পারব আমরা।'

গরিলার নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা। লোকটাকে ওর বডিগার্ড করা হয়েছে নাকি? আঠার মত সারাক্ষণ সেঁটে রয়েছে ব্যাটা গায়ের সাথে। মুচকে হাসল রানা। সিগারেটের মাথার আগুনের দিকে চেয়ে আছে আনমনে—ভাবছে। গরিলাকে কাবু করা কোন ব্যাপারই নয়। ওয়ালথারটা বেহাত হয়নি এখনও, আছে ওটা জায়গামতই। ইচ্ছে করলেই ওটা দেখিয়ে ব্যাটার পিলে খাঁচাছাড়া করে দিতে পারে রানা, হাত-পা বেঁধে ওকে ফেলে রেখে বেরিয়ে যেতে পারে কেউ কিছু টের পাওয়ার আগেই।

এইখানটায় চিন্তায় ছেদ পড়ল ওর। জাহেদ ওকে সার্চ করেনি, করার কথা চিন্তাও করেনি হয়তো। তার মানে লোকটা ধরেই নিয়েছে রানা তার মিশনের সদস্য। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, আরও একজনের সত্যি সত্যি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল দলে, শেষ সময়ে। এমন কেউ, যাকে কখনও সামনাসামনি দেখেনি ক্যাপ্টেন, হয়তো লোকটার চেহারা আর দৈহিক বর্ণনা ছাড়া জানেই না আর কিছু।

যে কোন কারণেই হোক, শেষ পর্যন্ত আসেনি সেই লোক। ফ্লাইট মিস্ করেছে। এবং ভুল করে জাহেদ রানাকেই সেই লোক ভেবে নিয়েছে। কেন? সেই লোকের সাথে চেহারা-সুরত আর দৈহিক দিক থেকে মিল আছে মাসুদ রানার? এবং তার নামও হাসান? মাথা ঝাঁকাল রানা। মোদ্দা কথা দাঁড়াল, বস্তাপচা ঢাকাই ছবির অসহায় দর্শকের মত পরপর এতগুলো দৈব-সংযোগ হজম করতে হবে ওকে। হায় খোদা! এমন বিপদেও পড়ে মানুষ!

কিন্তু ব্যাপারটা যে সেরকমই ঘটেছে, এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ রইল না ওর মনে। নইলে বারবার করে ভুলটা ধরিয়ে দেয়ার পরও কেন বুঝতে চেষ্টা করছে না জাহেদ? কেন একটা কথাও কানে তুলছে না?

নাকি কোন ব্লাইন্ড অপারেশন এটা? অকুস্থলে না পৌঁছানো পর্যন্ত বোঝা যাবে না রানার সাথে এদের কোন সংশ্রব আছে কি না? কিন্তু তাই যদি হয়,

তাহলে আরেকজনের নেতৃত্বে কেন? মাসুদ রানা কি ফুরিয়ে গেছে? নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা কি শেষ হয়ে গেছে ওর যে সে থাকতে আরেকজনকে দেয়া হবে মিশনের দায়িত্ব? নাহ্, হচ্ছে না। মনের মধ্যে কি কেন কিন্তু ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন, হাজারো সন্দেহ। হিসেব কিছুই মিলছে না।

ধুত্তোর! চিন্তার লাগাম টেনে ধরল রানা, এভাবে হবে না। তবে গড়বড় যে একটা হয়ে গেছে কোথাও, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং সেটা হয়েছে ক্যাপ্টেন জাহেদের তরফ থেকে, ওর তরফ থেকে নয়। ওদের এই যোগাযোগ দৈব-সংযোগ না হয়েই যায় না। যাক্‌গে, যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন আর ও নিয়ে মাথা গরম করে লাভ নেই। এখন বরং খুঁজেপেতে একটা পথ বের করতে হবে, কি করে এদের হাত থেকে উদ্ধার করা যায় নিজেকে। কি করে পৌঁছানো যায় দূতাবাসে।

প্রথম কাজ গোরাকে কাবু করে বেরিয়ে যাওয়া। কিন্তু তারপর? তারপর কিভাবে দূতাবাসে পৌঁছবে ও? প্রথম সমস্যা, এ শহরের পথঘাট চেনে না রানা। এদের ভাষাও জানে না যে জিজ্ঞেস করে পথের হদিস বের করে নেবে। দ্বিতীয় সমস্যা, প্রশাসন যদি সত্যিই টের পেয়ে গিয়ে থাকে যে বিদেশীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে রেঙ্গুনে, তাহলে নিশ্চয়ই বহুগুণ সতর্ক হয়ে আছে। রাত বিরেতে বিদেশ বিভূঁইয়ে তাদের হাতে ধরা পড়াটা মোটেই প্রীতিকর হবে না।

তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা, ওর পাসপোর্ট-টিকেট দুটোই হারিয়ে গেছে। এখন নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে থানায় ডাইরি করতে হবে ওকে, তারপর বিকল্প ট্রাভেল ডকুমেন্টের জন্যে যেতে হবে নিজেদের দূতাবাসে। কিন্তু পরেরটা সম্ভব হলেও প্রথমটা এ পরিস্থিতিতে মোটেই সম্ভব নয়। তা করতে গেলে ধরা খেতে হবে নির্ঘাত। এদেশে ঢুকলে কি করে—এই প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারবে না কর্তৃপক্ষকে।

আবার সেই অনুভূতিটা ফিরে এল, কি একটা যেন মনে পড়ব পড়ব করছে, অথচ মনে পড়ছে না শেষ সময়ে। কি সেটা? কি?

দরজা খুলে কামরায় ঢুকল কেউ। ঘুরে তাকাল রানা। পরমুহূর্তে জ্বলে উঠল ভেতরের উজ্জ্বল বাতি। হালকা কিছু নাশতা আর কফি নিয়ে এসেছে সোলায়মান।

'ওরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ক্যাপ্টেন জাহেদ?'

ট্রে ওর সামনের টেবিলের ওপর রাখল লোকটা। বলল, 'বাইরে গেছে।'

'কখন আসবে?'

'আমাকে বলে যায়নি।'

'আমরা এখন কি করব তাহলে? বসেই কাটাব রাতটা?'

'তাও বলতে পারি না,' দুহাত তুলে প্রায় আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল তালগাছ।

'ক্যাপ্টেন কিছুই বলে যায়নি?' সোজা হয়ে বসল রানা।

'হ্যাঁ, আপনার সাথে গল্প গুজব করতে বলে গেছে আমাকে।'

'আর কে কে গেছে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে?'

'লেফটেন্যান্ট, জসিম আর আমাদের দুজন লোক।'

'লেফটেন্যান্ট! সে আবার কে?'

'মিস্টার রাশেদ।'

জিনিয়া এসে ঢুকল এ সময় ঘরে। রানা লক্ষ করল, এখন আর চপ্পল নেই ওর পায়ে, একজোড়া স্পোর্টস কেড্স পরেছে। রানার মুখোমুখি বসে পড়ল জিনিয়া। পায়ের ওপর পা তুলে দিল।

'এসব কি হচ্ছে এখানে, জানতে পারি?' বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে গেল রানার। 'ধরে এনে আমাকে বসিয়ে রেখে কোথায় গেল ক্যাপ্টেন জাহেদ?'

থুতনি দিয়ে ট্রে দেখাল ওকে জিনিয়া। 'আগে কফিটা খেয়ে নিন। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। সোলায়মান, তুমি বাইরে যাও। খেয়াল রাখো চারদিক।'

বেরিয়ে গেল লোকটা ওকে কুর্নিশ করে। রানার দিকে ফিরল জিনিয়া, 'কই, নিলেন না কফি? আপনিও নিন, মিস্টার গোরা।'

রানা শুধু কফির কাপটা তুলে নিল। গরিলা ঝাঁপিয়ে পড়ল নাশতার প্লেটের ওপর।

'ক্যাপ্টেন জাহেদ রওনা হয়ে গেছেন। আমরাও যাব একটু পর,' বলল মেয়েটা।

'কোথায় গেছে?'

'থারাওয়াদ্দি।'

এ ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন করল না রানা। বুঝতে পেরেছে, যে কাজে এদেশে আসা এই মিশনের, শুরু হয়ে গেছে সেটা। জানা আছে ওর থারাওয়াদ্দি ছোট্ট একটা শহর, রেঙ্গুনের উত্তরে।

একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'আপনার পরিচয়টা জানতে পারি?'

'কেন?' সুন্দর চিকন ভুরুজোড়া ভাঁজ খেয়ে সামান্য ওপরে উঠে গেল জিনিয়ার। 'জাহেদ বলেননি আপনাকে?'

'নাহ্।'

ইতস্তত করতে লাগল মেয়েটা। 'তাহলে···তাহলে বরং ও প্রসঙ্গ এখন থাক, মিস্টার হাসান। এসেছেন যখন, সবই জানতে পারবেন আস্তে-ধীরে।'

'কি ঘটতে চলেছে, কিসের জন্যে আমরা এখানে এলাম, কিছুই তো বুঝতে পারছি না আমি।'

'সে কি!' এবার সত্যি সত্যি আশ্চর্য হলো জিনিয়া। 'কেন রেঙ্গুন এসেছেন, তা-ও জানেন না আপনি?'

'তা জানি,' ঝাঁঝের সাথে বলল রানা। 'আমি জানি আমি কেন এসেছি। কিন্তু ক্যাপ্টেন জাহেদ কি কাজে এসেছে, তা জানি না।'

'আপনি সিরিয়াস, মিস্টার হাসান?' দু চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে মেয়েটার। 'ক্যাপ্টেনের মিশন সম্পর্কে কিছুই জানেন না আপনি?'

'ড্যাম সিরিয়াস, জানি না। প্লেন থেকে জোর করে নামিয়ে এনেছে এরা আমাকে। বলছে, আমি নাকি এদের মিশনের সদস্য। অথচ এদের কাউকেই

আমি চিনি না, জীবনে দেখিওনি কোনদিন।'

'এক মিনিট। বলছেন, আপনি কেন এসেছেন এদেশে, তা আপনি জানেন। আবার বলছেন, এদের মিশন সম্পর্কে আপনার কোন ধারণাই নেই?'

'ঠিক তাই। আমি এসেছি আমার কাজে। এরা এদের কাজে। জাহেদ আসলে জানে না, আমি কেন এসেছি রেঙ্গুনে। অথচ দাবি করছে জানে। লোকটাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না বাংলাদেশ থেকে আমরা এসেছি ঠিকই, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন। শুনলই না সে। জোর করে ধরে এনেছে আমাকে। এই দেখুন, এই গরিলাটাকে রেখে গেছে আমাকে পাহারা দেয়ার জন্যে।'

কথা ভুলে গেছে জিনিয়া। প্রায় হাঁ করে চেয়ে আছে রানার মুখের দিকে। ওদিকে রানার ইংরেজি সবটা বুঝতে না পারলেও 'গরিলা' ও 'গার্ড' শব্দ দুটো ঠিকই বুঝল গোরা। মুখ খুলল সে, 'কিন্তু ক্যাপ্টেন···'

'গুলি মারো তোমরা ক্যাপ্টেনের,' থামিয়ে দিল রানা ওকে। 'সবাইকে একসাথে ডোবানোর ব্যবস্থা করেছে লোকটা। আমার সব প্ল্যান···' আচমকা থেমে গেল ও। খেয়াল হলো এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঢাকায় খবর হয়ে গেছে যে রোটর নিয়ে মাসুদ রানা পৌঁছায়নি রেঙ্গুন। হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন রাহাত খান, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন ভেতরে ভেতরে। ও যে প্লেনে উঠেছে, ঢাকা এয়ারপোর্টে খোঁজ নিলেই জানা যাবে। ওর গাড়িটাও আছে লাউঞ্জের সামনে। গিলটি মিয়া এসে নিয়ে যাবে।

ওর সঙ্গে অত্যাধুনিক ক্রিপটোসাইফার মেশিনের একটা পার্ট রয়েছে, ওটা নিয়ে হাওয়া হয়ে যেতে পারে না রানা। হয়তো হুলস্থুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে ঢাকায় এই নিয়ে। রাহাত খান, সোহেল হয়তো···। আর ভাবতে পারছে না রানা। ঝাঁ ঝাঁ করছে মাথার ভেতরটা।

কি মনে হতে উঠে দাঁড়াল জিনিয়া। 'আপনারা বসুন, আমি একটু আসছি,' বেরিয়ে গেল সে কামরা ছেড়ে।

ওর ভিড়িয়ে রেখে যাওয়া দরজার দিকে চেয়ে আছে রানা আনমনে। দূতাবাসে যদি একটা টেলিফোনও অন্তত করা যেত···টেলিফোন! তড়াক করে উঠে দাঁড়াল রানা, এতক্ষণ মনে পড়েনি কেন কথাটা, ভেবে নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠল। 'আমি একটা টেলিফোন করে আসি।'

'মানে!' চোখ পিটপিট করল গরিলা। 'কোথায়?'

'দূতাবাসে।'

'উঁহুঁ। সম্ভব না।'

পাত্তাই দিল না রানা লোকটাকে। বাঁ হাতে ব্যাগটা ঝুলিয়ে পা বাড়াল বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল গোরা, একলাফে দরজার সামনে গিয়ে ওর পথ আগলে দাঁড়াল। মুখে চাপা হাসি, যেন দেখতে চাইছে কি করে বেরোয় ও।

দৃঢ়, মাপা পায়ে লোকটার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। 'পথ ছাড়ো।'

মাথা নাড়ল গরিলা। 'বললাম না, ফোন করা যাবে না?'

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন রানার দেহে, ডান হাতটা পুরো খোলা রেখে চড়াৎ করে প্রচণ্ড এক চড় কষাল ও লোকটার গালে। ঠকাশ করে মাথাটা ঠুকে গেল গোরার দরজার চৌকাঠে। অবাক হলো রানা লোকটার সহ্য শক্তি দেখে। চড়ের চোটে পানি এসে গেছে চোখে, অথচ নিজেকে সামলে নিয়েছে সে মুহূর্তে। পিছিয়ে গেল রানা।

'যোঁৎ' করে একটা শব্দ করল গোরা মুখ দিয়ে, ইচ্ছে করে কি আপনাআপনি বেরুল শব্দটা বোঝা গেল না। মাথা নিচু করে বুলডোজারের মত ছুটে এল সে রানার দিকে। এত দ্রুত রি-অ্যাক্ট করবে ও, বুঝতে পারেনি রানা, হাজার চেষ্টা করেও লোকটার সামনে থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে ব্যর্থ হলো ও।

ছুটে এসে দড়াম করে গুঁতো মারল গোরা রানার তলপেটের নিচের অংশের বোন জয়েন্টে। নিজের অজান্তেই একটা আর্ত গোঙানি বেরিয়ে এল ওর গলা চিরে, ব্যাগ ছুটে গেছে হাত থেকে, উড়ে গিয়ে ওপাশের সোফার ওপর পড়ল ওটা। রানাকে ছাড়ল না গোরা, অ্যারিনার মধ্যে ম্যাটাডরকে বাগে পেয়েছে যেন হিংস্র আন্দালুসিয়ান ষাঁড়, দুহাতে ওর কোমর পেঁচিয়ে ধরে গুঁতো মারতে মারতে পিছনদিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। সেই সাথে বুনো জন্তুর মত আওয়াজ করছে গলা দিয়ে।

পাঁচ ছ'পা পিছিয়েই কার্পেটে পা বেধে গেল রানার, দড়াম করে আছড়ে পড়ল ও চিত হয়ে। গোরা পড়ল ওর ওপর। কার্পেট থাকলেও মাথাটা ভীষণ জোরে মেঝেতে ঠুকে গেল রানার। প্রচণ্ড ব্যথায় আঁধার হয়ে এল সবকিছু। ওঁদিকে একটা হাত ঝট্ করে মুক্ত করে নিয়েছে গোরা ওর দেহের নিচ থেকে, পরমুহূর্তে ওর চড়টা ফিরিয়ে দিল সে রানাকে। একই ভঙ্গিতে, প্রচণ্ড শক্তিতে মারল গোরা। ঠোঁট কেটে গেল রানার, দরদর করে রক্ত বেরুচ্ছে।

অন্ধের মত বাঁ হাতটা তুলল রানা, খপ্ করে গোরার থুতনি আঁকড়ে ধরল কাঁকড়ার মত। ঠ্যালা দিয়ে মুখটা সামান্য ওপরে তুলেই ডানহাতের আঙুলগুলো খাড়া রেখে ঝটাং করে মেরে বসল গরিলার নাকের নিচের নরম হাড়ে।

বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠেই দু হাতে মুখ ঢাকল গোরা। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে টকটকে লাল রক্ত। ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে বুকের ওপর থেকে নামিয়ে দিল রানা, গড়িয়ে সরে যেতে চাইল নিরাপদ দূরত্বে। কিন্তু কাৎ হয়ে পড়েই বিদ্যুৎবেগে বাঁ পা চালাল গোরা ওই অবস্থাতেই, ভারী আর্মি বুটের হিল ঠাস্ করে আছড়ে পড়ল এসে রানার কপালের পাশে। পরমুহূর্তে বাঁ কানের ওপর গোরার ওজনদার এক ঘুসি খেল রানা।

চোখের সামনে ঘরদোর সব দুলছে, তবু হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল রানা বহুকষ্টে। ঘন ঘন মাথা ঝাড়া দিয়ে আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে নিল। ওদিকে গোরাও উঠে পড়েছে। দেহ কোমরের কাছে সামান্য ভাঁজ করে রানার দিকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়েছে সে—দুহাত সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে কারাতে এক্সপার্টের

মত। ভয়ঙ্কর চেহারা হয়েছে তার, রক্তে ভেসে যাচ্ছে থুতনি, বুক। দু চোখ ছোট হয়ে এসেছে তার, এখন আর আগের মত অবজ্ঞা নেই চাউনিতে। কোপটা খেয়ে বুঝে গেছে, প্রতিপক্ষও যা-তা লোক নয়, একটু অসাবধান হলেই খারাবি আছে কপালে।

গোল হয়ে রানার চারপাশে ঘুরল কিছুক্ষণ লোকটা। এতে সুবিধেই হলো ওর, নিজেকে পুরোপুরি তৈরি করে নিল রানা এই সুযোগে। চট্ করে বাঁ পা বাড়িয়ে একটা ফলস স্টেপ নিল ও, এবং বিদ্যুৎবেগে পিছিয়ে এল সাথে সাথে। এতটা মোটেই আশা করেনি গরিলা, ওকে এগোতে দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সে সামনে, কিন্তু রানা ততক্ষণে ফিরে গেছে আগের অবস্থানে।

বাঁ হাতে দাও চালাবার মত করে কোপ ছুঁড়েছিল গোরা ওর ডান কাঁধ লক্ষ্য করে, কিন্তু অল্প কয়েক ইঞ্চির জন্যে মিস্ হয়ে গেল ভয়ঙ্কর মারটা, ফলে ভারসাম্য হারিয়ে এক পা বেশি এগিয়ে এল সে। গায়ের ঝাল মিটিয়ে মারল এবার রানা, দেহের সব শক্তি এক করে দড়াম করে নক্ আউট পাঞ্চ কষল লোকটার উন্মুক্ত বাঁ চোয়ালে। গুঙিয়ে উঠল গোরা, এলোমেলো পদক্ষেপে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। ওকে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ দিল না রানা, এক পা এগিয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠল ও, বাঁ পা সোজা রেখে ভয়ঙ্কর একটা কারাতে সাইড কিক্ মেরে বসল তার ভাঙা নাকের ওপর।

উড়ে গিয়ে পিছনের দেয়ালে আছড়ে পড়ল গরিলা, মাথার পিছনটা ঠকাশ্ করে বাড়ি খেল দেয়ালের গায়ে। মনে হলো পুরো বাড়িটা থর থর করে কেঁপে উঠল যেন। বসে পড়ল গোরা। বাঁ হাতে চেপে ধরে আছে নাকমুখ। চেহারায় পরিষ্কার আতঙ্ক।

আবারও এগোতে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় বিস্ফোরিত হলো ভিড়িয়ে রাখা দরজাটা। ঘরে ঢুকেছে কেউ। ফিরে চাইল রানা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তালগাছ। চোখ কপালে তুলে চেয়ে আছে ওদের দিকে। তার হাতে একটা অ্যাস্ট্রা দেখতে পেল রানা, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ধরে আছে। রানাকে নড়ে উঠতে দেখে বাজখাঁই গলায় বলে উঠল সে, 'ডোন্ট মুভ!'

শুনেও শুনল না রানা। ঘুরে দাঁড়াল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ওর চাঁদির ওপর আছড়ে পড়ল গোরার ওয়েবলি অ্যান্ড স্কটের ভারী বাঁট। চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘরটা, জ্ঞান হারিয়ে ধড়াস করে আছড়ে পড়ল মাসুদ রানা।

ঘণ্টাখানেক আগের ঘটনা।

টেলিফোনে কথা বলছে কর্নেল উ ক মঙ। কপাল ভুরু কুঁচকে কদাকার হয়ে আছে চেহারাটা। 'মারা গেছে?' বলল সে। 'কোথায়, বুকে লেগেছে গুলি? আচ্ছা···কজন? চার পাঁচজন? ট্রাকটার নাম্বার দেখতে পেয়েছে ও? গুড, নাম্বারটা বলুন।'

সামনের ডেস্ক ক্যালেন্ডারে খস খস করে লিখল সে নাম্বারটা। 'ঠিক আছে, দেখছি আমি। কি?···না, ব্যাপারটা একদম চেপে যান। সেলাই করে

ফেলুন মুখ। যা করার আমি করছি এদিকে। কোন্‌দিকে চলেছে ওরা, আন্দাজ করতে পারছি আমি। অ্যাঁ?··· সে আমি বুঝব। আর কোন প্রয়োজন যদি হয়, সাথে সাথে ফোন করবেন আমাকে। অফিসেই আছি আমি।'

দড়াম করে রিসিভার নামিয়ে রাখল কর্নেল। সামনের দেয়ালে ঝোলানো সিটিজেন কোয়ার্টজ্ ঘড়িটার সেকেন্ডের কাঁটার দিকে চেয়ে থাকল আনমনে। লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে ওটা, সেই সাথে তার চোখের মণিও লাফাচ্ছে। ঝাড়া দু মিনিট অনড় বসে থাকল লোকটা, তারপর নড়ল। বাঘের মত থাবা দিয়ে তুলে নিল রিসিভারটা। ফাইভ ডিজিটের একটা নাম্বার ঘুরিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল অধৈর্য চিত্তে।

ওপাশ থেকে সাড়া পেতেই উত্তেজিত গলায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে, 'মেজর?'

'ইয়েস, কর্নেল।'

'শোনো···'

প্রায় জনশূন্য সড়ক দিয়ে নিক্ষিপ্ত তীরের মত ছুটে চলেছে একটা বর্মী সামরিক জীপ, ল্যান্ড রোভার। চালাচ্ছে আবদুর রহমান। তার টিউনিক বলছে সে একজন সার্জেন্ট। পাশে গম্ভীর মুখে বসা লেফটেন্যান্ট রাশেদ। অবশ্য এ মুহূর্তে মেজর সে—মেজর থান্ট।

পিছনের আসনে বসেছে ক্যাপ্টেন জাহেদ আর জসিম। এরা দুজনই লেফটেন্যান্ট। জসিমের পায়ের কাছে সেই রাকস্যাকটা দেখা যাচ্ছে। হু হু বাতাসে দু চোখ আপনাআপনি বুজে আসছে পিছনের দুজনের। কিন্তু রাশেদ বসে আছে শিরদাঁড়া খাড়া করে। পলকহীন চোখে চেয়ে আছে সামনের দিকে।

আরও দু মাইলের মত এগিয়ে বাঁয়ে ঘুরল ল্যান্ড রোভার, উঠে এল রেঙ্গুন-থারাওয়াদ্দি হাইওয়েতে। প্রায় সাথে সাথে গতি কমাতে হলো আবদুর রহমানকে, সামনে রাস্তার পাশে কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটো ফাইভ হানড্রেড সি সি প্রকাণ্ড মোটর সাইকেল। তার সামনে চারজন খাকি পোশাক—পুলিস!

'গাড়ি রাখো,' চাপা গলায় আবদুর রহমানকে বলল রাশেদ। 'ক্যাপ্টেন,' মুখটা সামান্য ডানে ঘুরিয়ে পিছনের আরোহীদের উদ্দেশে বলল, 'ক্যাপ টেনে নামিয়ে দিন যতটা পারেন। ঘুমের ভান করুন।'

হাত তুলল একজন পুলিস অফিসার। ঠিক তার সামনেই ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল রহমান। এগিয়ে এল অফিসার। একটু ঝুঁকে রাশেদের মুখটা দেখল ভাল করে, পরক্ষণেই সোজা হয়ে গেল তার কাঁধের ব্যাজের ওপর চোখ যেতে। খটাশ্ করে স্যালুট করল লোকটা। তার দেখাদেখি অন্যরাও।

'কি ব্যাপার, আপনারা?' জানালা দিয়ে মুখ বের করে কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল লেফটেন্যান্ট।

'জ্বি, মেজর,' আমতা আমতা করতে লাগল অফিসার। 'গোপন সূত্রে

খবর পেয়েছি কিছু চোরাই মাল পাচার হবে আজ রেঙ্গুন থেকে। এই পথেই যায় কি না, ব্যাপারটা চেক করার জন্যে···'

'এই গাড়িটা কি চোরাই মাল পাচারের কাজে ব্যবহার হতে পারে বলে ভাবছেন?'

'না না,' যেন লজ্জা পেয়েছে লোকটা, এমনভাবে মাথা চুলকাতে লাগল। 'কি যে বলেন, স্যার। হেঁ হেঁ!'

'তো!'

'এমনিই, স্যার, মানে রুটিন চেক আর কি!'

ওরা যখন কথা বলছে, সেই ফাঁকে গাড়িটার পিছনে রাস্তার ধারের একটা ঝোপ থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি। গাড়িটার কাছে এসে বসল, হাত বাড়িয়ে কি যেন একটু করল। এক মুহূর্ত মাত্র, তারপর যেমন এসেছিল, তেমনিভাবে পিছিয়ে গিয়ে আগের জায়গায় গা ঢাকা দিল ছায়ামূর্তি।

'আমার গাড়ি চেক করবেন?' রাশেদের গলায় প্রচ্ছন্ন হুমকি।

জিভ কাটল অফিসার। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেয়েছে পিছিয়ে যাচ্ছে ছায়ামূর্তিটা। 'কেন লজ্জা দিচ্ছেন, স্যার! তা স্যার, আপনার নামটা যদি···।'

'থান্ট, মেজর থান্ট। আর্মি ইন্টেলিজেন্স।'

আবার স্যালুট করল সবাই। 'কিছু মনে করবেন না, মেজর। আপনি যেতে পারেন।'

পাশ ফিরল রাশেদ। 'চালাও, সার্জেন্ট।'

একরাশ ধুলো উড়িয়ে ভোঁ করে ছুট লাগাল ল্যান্ড রোভার।

নিজের অফিস কামরায় পায়চারি করছে কর্নেল মঙ। দু হাত পিছনে বাঁধা, বারবার মুঠো করছে আর খুলছে। থমথমে হয়ে আছে মুখটা। বেশ উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে তাকে। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার দিকের দেয়ালজোড়া খোলা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে কখনও, ঝুঁকে পড়ে নজর বোলাচ্ছে নিচের মসৃণ প্রশস্ত সুলে প্যাগোডা রোডের এ মাথা ও মাথা। রাত বাড়ছে। ক্রমেই কমে আসছে যানবাহনের আনাগোনা।

দড়াম করে খুলে গেল কামরার দরজাটা। ঘুরে দাঁড়াল কর্নেল। এক লোক এসে দাঁড়াল ভেতরে—বেশ উত্তেজিত, মুখটা হাসি হাসি।

'কি,' ভুরু নাচাল কর্নেল। 'শুরু হয়ে গেছে?'

'জ্বি, কর্নেল,' দাঁত বের করে হাসল লোকটা। 'এত স্পষ্ট "ব্লিপ" দিচ্ছে, কি বলব! এ জিনিসের তুলনাই হয় না কোনও।'

বুকের ওপর থেকে ভারী একটা পাথর যেন সরে গেল কর্নেলের। লম্বা করে দম নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। এসব জিনিস তৈরিতে আমেরিকানদের চাইতে রাশিয়ানরাই বেশি ওস্তাদ। আর কোন খবর?'

'একটা হাইওয়ে পেট্রল জানিয়েছে পাঁচ মিনিট আগে ওদের ক্রস করেছে ল্যান্ড রোভারটা। থারাওয়াদ্দির দিকে যাচ্ছে।'

'যাক,' বিড়বিড় করে বলল কর্নেল। 'আমি তো ভাবছিলাম, গেল বুঝি এবারও হাত ফসকে বেরিয়ে।'

'জ্বি, স্যার?' বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

তার চোখে চোখ রাখল কর্নেল। ধীরে ধীরে প্রসারিত হলো টায়ারজোড়া। কেন কে জানে, হাসছে সে। 'না, কিছু না,' বলল সে। 'ও তুমি বুঝবে না।'

অজ্ঞান রানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে রক্তাক্ত গোরা। নিঃশ্বাস পড়ছে তার ঝড়ের বেগে। রুমাল দিয়ে রক্ত ঘাম যথাসম্ভব মুছে নিয়ে কিছুক্ষণ রানার দিকে চেয়ে থাকল সে পলকহীন চোখে। চিন্তিত। এ লোক যে আর দশজনের মত সাধারণ নয়, তা সে আগেই টের পেয়েছিল এয়ারপোর্টে এর ক্যাপ্টেনের কলার ধরা দেখে। এখন দেখা যাচ্ছে ভুল নেই ওর ধারণায়।

সোলায়মানের দিকে তাকাল গোরা, দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে লোকটা। দরজাটা টেনে বাইরে থেকে লাগিয়ে দিয়ে ধুপধাপ পা ফেলে ছুটল সে। আবার রানার দিকে নজর দিল গোরা। সুদর্শন মুখটায় কোমলতা আর কাঠিন্য পাশাপাশি বিরাজ করছে, সব মিলিয়ে চেহারাটা কেমন যেন, নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর লাগে। নাহ্, সত্যি কিছু একটা আছে এর মধ্যে। এর হাঁটা-চলা, আচার-আচরণ সবই যেন কেমন আলাদা, ওদের থেকে স্বতন্ত্র। আর রয়েছে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, প্রথম থেকেই লক্ষ করে আসছে সে। তাছাড়া···নিজের ভাঙা নাকে আলতো করে হাত বোলাল, এই মার কোথায় শিখেছে এ লোক? বক্সিং আর কারাতে, দুটোতেই সমান ওস্তাদ! কি ভেবে রানাকে সার্চ করতে শুরু করল গোরা। কিন্তু কাজটা শুরু করতে না করতেই থামতে হলো ওকে। কোটটা সরে যেতে বেরিয়ে পড়ল রানার শোল্ডার হোলস্টার। হাঁ করে ওটার দিকে চেয়ে থাকল গোরা ঝাড়া দশ সেকেন্ড। তারপর সচকিত হলো, টান মেরে ওয়ালথারটা বের করে এনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। মুখটা হাঁ হয়েই আছে, ভুলে গেছে বন্ধ করার কথা।

নিজের বুকের কাছের একটা বোতাম খুলে ওটা তাড়াতাড়ি ভেতরে ছেড়ে দিল সে। এবার রানার কোটের ভেতরের পকেটে হাত ঢোকাল। দুটো কি যেন বের হলো, দুটো সুদৃশ্য পলিথিনের প্যাকেটে ভরা, গোল—বেশ ভারী। প্যাকেটের মুখ সীল করা। উল্টেপাল্টে দেখল গোরা ও দুটো। কোন সীল ছাপ্পড় কিচ্ছু নেই গায়ে।

জিনিসটা যা-ই হোক, খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, ভাবল সে। রেখে দিল আবার আরেক জায়গায়। এই সময় রানার পাশেই কার্পেটের ওপর পড়ে থাকা কি যেন একটা চিক্ চিক্ করে উঠল। জিনিসটা তুলে নিল গোরা। দু মাথা ভোঁতা, পিনের মত, স্টেইনলেস স্টীলের। চোখ কুঁচকে জিনিসটার দিকে চেয়ে থাকল সে, কি হতে পারে, বুঝতে পারছে না। নাড়াচাড়া করতে করতে আঙুলের ফাঁক গলে পড়ে গেল পিনটা। ওটা খোঁজার কোন গরজ অনুভব করল না গোরা। অন্য পকেটগুলো হাতড়াতে লাগল রানার।

সবশেষে ওর হিপ্ পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করল গোরা। ওটা খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। এত টাকা কারও পকেটে থাকতে পারে, কল্পনাই করেনি ও। বেশিরভাগই ডলার। এছাড়া কিছু বাংলাদেশী টাকা আর বার্মিজ 'কায়াত', সব মিলিয়ে বিরাট এক অঙ্ক।

এই সময় হঠাৎ পায়ের আওয়াজ উঠল বাইরে। তাড়াতাড়ি মানিব্যাগটা রানার হিপ পকেটে গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়াল গোরা। আরেকবার মুছে নিল নাকমুখ। দরজা খুলে ভেতরে পা রাখল জিনিয়া। রানাকে পড়ে থাকতে দেখে আঁতকে উঠল। 'এ কি! কি হয়েছে?' দ্রুত ওর পাশে এসে বসে পড়ল সে। পিছন পিছন সোলায়মানও এসে দাঁড়িয়েছে দোরগোড়ায়।

গুঙিয়ে উঠে পাশ ফিরল রানা। নাকে মিষ্টি একটা গন্ধ ঢুকতে চোখ মেলে চাইল। ওর মুখের ওপর ঝুঁকে আছে উদ্বিগ্ন জিনিয়া। তার বাড়ানো হাত ধরে ধীরে ধীরে উঠে বসল রানা। মাথা ঝাড়া দিল কয়েকবার, সাথে সাথে চোখমুখ কুঁচকে উঠল যন্ত্রণায়। গোরার দিকে ফিরল এবার জিনিয়া। 'মারামারি করেছেন আপনারা?'

'ফোন করতে যাচ্ছিলাম আমি,' বলল রানা। 'ও বাধা দিতে···'

'কোথায় ফোন করতে যাচ্ছিলেন?'

'আমাদের এমব্যাসিতে।'

'কেন!' চোখ কপালে উঠল মেয়েটার।

'আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।'

'ও মাই গড! ভাগ্য ভাল···আপনি জানেন না, মিস্টার হাসান, কি সাঙ্ঘাতিক কাজ করতে যাচ্ছিলেন আপনি।'

'মানে?'

'সমস্ত কল ট্যাপ করা হয় এদেশে। টেলিফোন নাম্বারের সূত্র ধরে দশ মিনিটে এসে হাজির হত আর্মি।'

চুপ করে থাকল রানা। কি মনে হতে চট্ করে হাত দিল হোলস্টারে—শূন্য। ঠাণ্ডা চোখে গোরার দিকে তাকাল ও।

'যাক্‌গে, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এবার উঠুন,' হাত উল্টে ঘড়ির ওপর চোখ বোলাল জিনিয়া। 'প্রায় সাড়ে বারো বাজে। তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া দরকার। অন্ধকার থাকতে থাকতে জায়গামত পৌঁছুতে হবে আমাদের।'

ছয়

চট্টগ্রাম। ঘড়ি অনুযায়ী এখনও এক ঘণ্টার মত বাকি সন্ধে নামতে। অথচ আকাশের ঘন কালো মেঘের নিশ্ছিদ্র পর্দাটা অসময়েই রাত নামিয়ে ছেড়েছে আজ কর্মব্যস্ত বন্দরনগরীতে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত টানা বৃষ্টি হয়েছে। মাঝে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে আবার কাঁদতে বসেছে আকাশ, থামার কোন

লক্ষণ নেই। মেঘ বরং ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে আরও।

ডবল মুরিঙে বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রকাণ্ড ভবনটার পাশেই স্টার ফিশিং লিমিটেডের অফিস। শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আফতাবুজ্জামান চৌধুরী এর মালিক। বিরাট মাছের ব্যবসা ভদ্রলোকের। ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় শ' খানেক ট্রলারের মালিক। কাজ ছাড়া কিছুই বোঝেন না ভদ্রলোক। কিন্তু মেজাজটা আজ খিঁচড়ে আছে তাঁর। এই বৃষ্টির জন্যে অনেকগুলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল হয়ে গেছে।

কর্মচারীরা প্রায় সবাই চলে গেছে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই। অথচ এখন মাছের মৌসুম চলছে। রাত নটা-দশটা পর্যন্ত কাজ হয় এ সময় একনাগাড়ে। কিন্তু কি আর করা! ঘড়ি দেখলেন চৌধুরী—সাতটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। নাহ্, এবার উঠতে হয়। বরং চট্টগ্রাম ক্লাবের দিকে যাওয়া যাক। গত সপ্তাহে তাঁকে সুকারে হারিয়ে দিয়েছিলেন জাঁদরেল ব্যাংকার মুস্তাফিজুর রহমান। দেখা যাক আজ প্রতিশোধ নেয়া যায় কি না। টেবিলের ওপর ঢেকে রাখা পানিটুকু দুঢোকে খেয়ে নিয়ে পিওনের উদ্দেশে বেল বাজালেন আফতাবুজ্জামান।

টেলিফোনটাও বেজে উঠল ওই সাথে।

'হ্যালো।'

'চৌধুরী সাহেব আছেন?'

'জ্বি, বলছি।'

'স্লামালেকুম। আমি ক্যান্টনমেন্ট থেকে বলছি, মেজর আনোয়ারুল ইসলাম কথা বলবেন আপনার সাথে।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। দিন ওনাকে।' মেজরের চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল চৌধুরীর। দু'বছর আগে পরিচয়। কয়েকজন বন্ধু নিয়ে একদিন হঠাৎ করেই তাঁর একটা ট্রলার ভাড়া করতে এসেছিল লোকটা। যদিও তার উদ্দেশ্য কি ছিল আজও জানেন না চৌধুরী, জিজ্ঞেস করায় পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল মেজর। তবে প্রত্যাশার চাইতে অনেক বেশি টাকাই পেয়েছিলেন তিনি সেবার। আজও কি···?

'স্লামালেকুম।'

'ওয়ালাইকুম আসসালাম। অ্যাদ্দিন পর গরীবের কথা মনে পড়ল বুঝি?'

মেজরের হাসি শোনা গেল। 'কি যে বলেন, ভাই! তারপর? আছেন কেমন? ভাবী, ছেলেমেয়েরা সব ভাল তো?'

'আল্লার রহমত, ভাল। তা কি মনে করে, ভাই?'

'আপনি আরও কিছুক্ষণ অফিসে থাকুন। আমি আসছি।'

'আসবেন?'

'হ্যাঁ। ধরে নিন, রওনা হয়ে গেছি।'

'ঠিক আছে, চলে আসুন।' টাকার গন্ধ ঠিকই নাকে গেছে বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর। সামনেই দাঁড়িয়ে থাকা পিওনের হাতে একশো টাকার একটা নোট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ড্রাইভারকে নিয়ে সার্কিট হাউসে যাও, জলদি।

গরম গরম কাবাব নিয়ে এসো। দৌড় দৌড়।'

ঠিক সাতটা বিশে অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল একটা জলপাই রঙের টয়োটা জীপ। পিছনে হুড ফেলা পাঁচ টনি বেডফোর্ড ট্রাকও আছে একটা। মনে মনে সামান্য বিস্মিত হলেন চৌধুরী ট্রাকটা দেখে। উঠে গিয়ে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি মেজরকে। সাদা পোশাকে রয়েছে মেজর, বাঁ হাতে একটা ব্রীফকেস।

'আসুন, আসুন! কি ব্যাপার, একেবারে সৈন্য সামন্ত নিয়ে মনে হচ্ছে?'

শেষেরটুকু শুনতে পায়নি হয়তো মেজর। শুনলেও পাত্তা দিল না। 'বেশিক্ষণ বসার উপায় নেই, ভাই। জরুরী।'

'তা তো বটেই। আপনি কি আর জরুরী আলাপ ছাড়া এসেছেন?' হাত ইশারায় একটা চেয়ার দেখালেন তিনি মেজরকে, 'বসুন।'

'ধন্যবাদ।' ব্রীফকেসটা টেবিলের ওপর রেখে বসল অফিসার।

'বলুন, স্যার, কি করতে পারি আপনার জন্যে।'

সরাসরি কাজের কথা পাড়ল মেজর। 'দুটো বড় ধরনের ট্রলার দরকার হয়ে পড়েছে হঠাৎ করে।'

'দুটো? কখন দরকার?'

'আজই, এই মুহূর্তে।'

'সে কি, সাহেব!' বলেই নিজেকে সামলে নিলেন চৌধুরী। 'অবশ্য আপনি বলতে না চাইলে কিছু জিজ্ঞেস করছি না আমি। তা, ভয়েজ কি লম্বা?'

'একেবারে কমও নয়। একটা ধরুন, সাতশো সাতশো চোদ্দশো মাইল রান করবে। অন্যটা প্রায় নয়শো মাইল। তবে কন্ডিশন ভাল হওয়া চাই।'

'নো প্রবলেম। এই সেদিনই দুটো তৈরি করিয়েছি। একেবারে নতুন। কাজে লাগানো হয়নি এখনও। খুব ফাস্ট, গতি প্রায় বিশ নট। তবে একটা একটু ছোট, ষাট বাই বিশ। অন্যটা আশি বাই তিরিশ। চলবে না?'

'খুব চলবে।'

'কিন্তু, মেজর, আকাশের অবস্থা তো ভাল মনে হচ্ছে না। সিগন্যাল-টিগন্যাল আছে কিনা···'

'আছে। চার নম্বর। কিন্তু উপায় নেই, এরই মধ্যে যেতে হবে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন চৌধুরী। 'আমার কোন আপত্তি নেই। আমি বলছি আপনাদের কথা ভেবে।'

ব্রীফকেস খুলল মেজর আনোয়ারুল ইসলাম। পাঁচশো টাকার নোটের কড়কড়ে দুটো বান্ডিল বের করে এগিয়ে দিল, 'নিন। অ্যাডভান্স। বাকিটা কাল পেয়ে যাবেন। এক ঘণ্টার মধ্যে রেডি করে দিতে পারবেন না ট্রলার দুটো?'

একেই বলে ভাগ্য, ভাবছেন মৎস্য ব্যবসায়ী। কথা নেই বার্তা নেই এক লাখ টাকা এসে হাজির। 'অবশ্যই। শুধু সাফিশিয়েন্ট ডিজেল লোড করলেই রওনা হতে পারেন আপনি। একটু বসুন, আমি ওদুটোর সারেঙকে খবর পাঠাচ্ছি।'

'ওদের এটাও জানিয়ে দেবেন, আমরা যখন যা বলব, মুখ বুজে শুধু ফলো

করে যাবে। আগেরবারের মত আর কি।'

'অবশ্যই। বলে দেব।'

'আর···'

'কি?'

'বলছিলাম, ট্রলার দুটোয় যদি হেভি কোন লোড চাপানো যেত, সুবিধে হত। লাফালাফি কম করত। কি রকম ঢেউ দিচ্ছে সাগর, কে জানে।'

'বলেন তো পোর্ট অথরিটির হেভি ক্রেন শক্তিমানকে তুলে দিই। মোটেও দুলবে না ট্রলার,' বলেই গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন চৌধুরী হা হা করে। মন্তব্য শুনে হেসে ফেলল মেজরও।

'তা মন্দ হয় না।'

'চলুন। আমিও যাচ্ছি ঘাটে। দেখি, কি ভাবে কি করা যায়।' বান্ডিল দুটো স্টীলের আলমারিতে তুলে রাখলেন আফতাবুজ্জামান। পিওনটা এসে ঢুকল এই সময়। প্লেটে করে গরম কাবাব সাজিয়ে দিল দুজনের সামনে।

মৃদু আপত্তি জানাল মেজর, 'আহা, এসব আবার করতে গেলেন কেন এখন!'

'আরে খেয়ে নিন, ভাই। এক ঘণ্টা সময় তো আছেই হাতে।' পিওনের দিকে ফিরলেন চৌধুরী। 'এক দৌড়ে ঘাটে যাও। জননী আর ওসমানীকে ছাড়ার জন্যে তৈরি হতে বলো গিয়ে। আর গোডাউন খুলে যত নষ্ট এনজিন, স্ক্র্যাপ যা যা আছে সব জড়ো করো ঘাটে। আমি আসছি এখনই। যত লোক লাগে, লাগাও।'

ঠিক এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট পর ডবল মুরিঙের সোজাসুজি ওপার থেকে রওনা হলো আনকোরা দুটো নতুন ফিশিং ট্রলার। রেডিওতে তখন পাঁচ নম্বর সিগন্যাল ঘোষণা করা হচ্ছে, সমস্ত ছোট নৌযানকে বারবার করে উপকূলের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে আসার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু সেদিকে কোন খেয়ালই নেই এ দুটোর।

ঢেউয়ের মাথায় চড়ে নাচতে নাচতে পূর্ণ গতিতে ছুটছে তারা খোলা সাগরের উদ্দেশে। দূর থেকে আরেকটা বড় নৌযান অনুসরণ করে চলেছে ট্রলার দুটোকে। বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর একটা অত্যাধুনিক ডেস্ট্রয়ার ওটা, বি এন এস শাহজালাল। কিন্তু কোন আইডেন্টিফিকেশন মার্ক নেই ওটায় এ মুহূর্তে। নেই, মানে আছে, ঢেকে রাখা হয়েছে মাস্কিং টেপ দিয়ে। তার ওপর স্প্রে করা হয়েছে রঙ, জাহাজের রঙের সাথে মিলিয়ে।

রাত বারোটার দিকে পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল ট্রলার দুটো। ছোটটা, এফ.বি. জননী, কোর্স ঘুরিয়ে ছুটল দক্ষিণ পুবে। এফ.বি. ওসমানী আগের কোর্সেই থাকল। চলেছে সোজা দক্ষিণে, গভীর সমুদ্রের দিকে। মেজর আনোয়ারুল ইসলামের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনা ও নৌ বাহিনীর ষোলোজনের চৌকস, অকুতোভয় একদল কমান্ডো রয়েছে ওটায়।

বি এন এস শাহজালালও বদলায়নি কোর্স। ওসমানীর পিছন পিছন ছুটছে

সে।

পিছনের দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা। জিনিয়া আর সোলায়মান আগে। ওদের পিছনে রানা আর গোরা। সবার পিছনে স্টেনধারী দুই যুবক। এদেরকে এই প্রথম দেখছে রানা। জানে না, একটু আগে এই দুজনই ছিল মিঙ্গালাদন ক্যাফেটেরিয়ায়।

বাদামী রঙের প্রায় নতুন একটা মিটসুবিশি ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তায়। পিছনটা ত্রিপলের হুড দিয়ে ঢাকা। দুই যুবক উঠে পড়ল পিছনে। ড্রাইভারের উল্টোদিকের ক্যাবডোরের দিকে এগোতে গিয়েও কি মনে করে দাঁড়াল জিনিয়া। রানার দিকে ফিরে বলল, 'আপনি পিছনে উঠুন।'

'সামনে বসতে চাই আমি,' বলল ও। 'কথা বলা দরকার আপনার সাথে।'

'এখন নয়। শহর ছেড়ে বেরিয়ে নিই আগে, তারপর। কেমন?'

'বেশ।' ঘুরে দাঁড়াল রানা। এক লাফে উঠে পড়ল ক্যারিয়ারে। গোরাও উঠল ওর পিছন পিছন। আগেই ড্রাইভিং সীটে উঠে বসেছে সোলায়মান। স্টার্ট দিল সে। চলতে শুরু করল ট্রাক ধীরগতিতে। সামনে কতগুলো ভাঁজ করা কম্বল দেখতে পেয়ে দুটো তুলে নিল রানা। একটার ওপর আরেকটা রেখে বসার জন্যে একটা গদি তৈরি করল। এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল ক্যাবের দেয়ালে পিঠ দিয়ে।

অলিগলি পার হয়ে বড় রাস্তায় উঠে এল ট্রাকটা। উঠেই ছুটল তীরবেগে। ক্যানভাসের ঢাকনা সামান্য ফাঁক করে পিছনদিকে চেয়ে আছে অস্ত্রধারী দুই যুবক। গোরা বসেছে রানার দিকে মুখ করে। তার মুখটা আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে দ্রুত অপসৃয়মাণ রাস্তার আলোয়। গাড়ির দুলুনিতে বসতে পারছে না স্থির হয়ে, ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে বিশাল দেহটা। ওর প্রতি আগের সেই অবজ্ঞার ভাব এখন আর নেই লোকটার। মারামারি হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত যতবার চোখাচোখি হয়েছে, খেয়াল করেছে রানা, কেমন এক অন্যরকম দৃষ্টিতে লক্ষ করছে যেন ওকে গরিলা। যেন কি এক ভাবনায় ডুবে আছে। ওর থেকে একটা সশ্রদ্ধ দূরত্ব বজায় রেখে চলছে।

সিগারেটের ধোঁয়া নাকে যেতে সচকিত হলো মাসুদ রানা। টেইল বোর্ডে বসা অস্ত্রধারী দুই যুবক সিগারেট ধরিয়েছে। ও নিজেও ধরাল একটা সিলভার কাট। প্যাকেটটা চোখের সামনে তুলে ধরে গুনে দেখল আরও বারোটা সিগারেট আছে। আজ সকালে সোহেল দিয়েছিল ওকে প্যাকেটটা। বেচারা! এতকিছুর মধ্যেও হাসি পেল রানার। কখনও পুরো প্যাকেট ওর সামনে বের করে না সোহেল। আজ কি মনে করে দিল কে জানে! মনে হয়, জান বাঁচানো ফরজ ভেবে তাড়াতাড়ি ধরে দিয়েছে সামনে, অন্যান্যবারের মত সময় পায়নি আগেভাগে প্যাকেট খালি করার।

আগে যেখানে দূরে দূরে হলেও এক আধটা বাতি ছিল রাস্তায়, এখন তা-ও নেই। রাস্তাটাও সরু হয়ে এসেছে অনেক, বেড়ে গেছে ট্রাকের লাফঝাঁপ।

প্রতি মিনিটে একটু একটু করে রেঙ্গুন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ওরা।

পিস্তলটা নেই, ভাবছে রানা, হোলস্টার থেকে বের করে নিয়েছে গরিলা। দুটো ছোট পলিথিনের প্যাকেট ছিল পকেটে। ও দুটো স্পর্শ করেনি বোধহয় লোকটা, যেখানে ছিল সেখানেই আছে। ক্যাপ্টেন জাহেদের কথা ভাবল রানা, যখন ভুল ভাঙবে, কি হবে ওর মানসিক অবস্থা? কতটা ক্ষতি হবে মিশনের? নাকি ভণ্ডুল হয়ে যাবে পুরোপুরি? এ ব্যাপারে জাহেদকে যে রকম ডেসপারেট মনে হচ্ছে, সত্যিই যদি শেষ পর্যন্ত মিশন ক্লোজ করার মত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, কি হবে তখন?

কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে দুই যুবক। এরই মধ্যে নাক ডাকতে শুরু করেছে দুজনেই। কিন্তু গোরার মধ্যে কোনরকম ক্লান্তির আভাস পর্যন্ত নেই, বসে আছে তেমনি, শিরদাঁড়া টানটান করে। চলতে চলতে আচমকা একটা 'ইউ' টার্ন নিল ট্রাক, সেই সাথে শুরু হলো উন্মত্ত লাফালাফি। পাকা রাস্তা ছেড়ে একটা মেঠো পথে নেমে পড়েছে ওটা। অল্পক্ষণের মধ্যেই ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সবকিছু। ফ্ল্যাপের ফাঁক দিয়ে ভেতরেও ঢুকেছে প্রবলবেগে। নাকে রুমাল চাপা দিতে বাধ্য হলো রানা।

দু-দুটো কম্বল ভাঁজ করে তৈরি করা গদিতেও কাজ হচ্ছে না এখন, নিতম্ব ব্যথা হয়ে গেল অল্পক্ষণের মধ্যেই। ঝাঁকিতে ফ্ল্যাপ সরে গেলে তারার আলোয় আবছাভাবে উঁচু নিচু একটা রেখা দেখতে পাচ্ছে রানা আকাশের গায়ে। পাহাড় সারি।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলল লাফালাফি। আবার পাকা রাস্তায় উঠে এল ট্রাক। মোটামুটি ধারণা করল রানা, উত্তর পশ্চিম দিকে চলেছে গাড়ি। কখন যেন একটু ঢুলুনিমত এসে গেল, ক্লান্তিতে আপনাআপনি বুজে এল দুচোখ।

হঠাৎ কেটে গেল ঘোর। থেমে পড়েছে ট্রাক। চোখ মেলল রানা। ঘুরে ক্যাবের পিছনে কাঁচের দেয়ালের ওপাশে তাকাল। ছোট্ট একটা পেট্রল পাম্পে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। পাম্পের অফিসরূমের কপালে হলদেটে, বড় বড় করে লেখা ESSO। রোদ আর ঝড় বৃষ্টিতে আবছা হয়ে গেছে লেখা। কিন্তু জায়গাটার নাম লেখা দেখল না ও কোথাও।

তেল নিয়ে ট্রাক রওনা হওয়ার আগে পিছনে চলে এল জিনিয়া। রানার পাশে এসে বসল সে। 'এখানে বসতে নিশ্চই কষ্ট হচ্ছে?'

'হচ্ছে,' সোজাসাপ্টা উত্তর দিল রানা।

'আমি দুঃখিত। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও নেই কোন। আপনাকে সামনে বসানোর ঝুঁকি নিতে পারি না আমি, কারও চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

উত্তর দিল না রানা। আরেকটা সিগারেট ধরাল। টানতে লাগল চুপচাপ। ও কিছু বলছে না দেখে খানিক উসখুস করল জিনিয়া, তারপর বলল, 'ক্যাপ্টেন জাহেদের মিশনের ব্যাপারে সত্যিই কি কিছুই জানেন না আপনি?'

'না। জানি না।'

অন্ধকারে রানার মুখের দিকে চেয়ে থাকল মেয়েটা কিছুক্ষণ। ঠোঁট মুড়ে

কপাল কুঁচকে ভাবছে কি যেন। 'বলছেন, ক্যাপ্টেন কিছুই জানায়নি আপনাকে?'

পাল্টা প্রশ্ন করল ও, 'কোথায় চলেছি আমরা?'

'নাম বললেও জায়গা চিনবেন না আপনি। ছোট্ট একটা গ্রাম, পাহাড়ের ওপর। ক্যাপ্টেন জাহেদ আছেন ওখানে।'

'আলাদা আলাদা হয়ে যাওয়া কেন?'

'নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিশেষ একটা কাজ সারতে হবে তাঁকে ওখানে গিয়ে। আগে রওনা না হলে দেরি হয়ে যেত ক্যাপ্টেনের। তাছাড়া সাবধানতার ব্যাপারও আছে।'

'দেরি হয়ে যেত, কিসের?'

'মিশন পৌঁছে গেছে, খবরটা তাঁকে জানাতে হবে তাঁর প্রিন্সিপ্যাল কন্ট্যাক্টকে।'

'অয়্যারলেসে?'

'হ্যাঁ,' বলেই চুপ মেরে গেল জিনিয়া। বোঝা গেল এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলতে রাজি নয়।

'এরা কারা?' স্টেনধারী দুই যুবককে দেখাল রানা।

'আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। আমাদের সংগঠনের নীতি-আদর্শে নিবেদিত যোদ্ধা এরা প্রত্যেকে।'

'এতসব কিসের জন্যে, ক্যাপ্টেন জাহেদ এখানে কেন, বলবেন না নিশ্চই?'

আমতা আমতা করল কিছুক্ষণ জিনিয়া। বলল, 'মিস্টার হাসান, আপনি নিজে এই মিশনের একজন সদস্য…' রানা মুখ খুলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে বাধা দিল। '…অন্তত আমাকে তাই বলা হয়েছে। সত্যি কি মিথ্যে পরে প্রমাণ হবে। কিন্তু আমার কাছে ওটাই সত্যি এ মুহূর্তে। ক্যাপ্টেন নিজে যখন এ ব্যাপারে জানাননি আপনাকে, আমার মনে হয়, আমারও কিছু বলতে যাওয়া ঠিক হবে না। আমার সমস্যাটা…'

'আচ্ছা, বেশ,' থামিয়ে দিল ওকে রানা। 'আপনার সংগঠনটা কিসের, কি এর উদ্দেশ্য, তাও বলা যাবে না?'

'তা বলা যাবে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি নিজেও জানি না খুব একটা। বিদেশে লেখাপড়া করি আমি। ছুটিতে দেশে বেড়াতে এসেই জড়িয়ে গেছি ভয়ঙ্কর এক চক্রান্তের জালে। আটকে গেছি। তবু যেটুকু জানি, বলছি। এরা এদেশের জনগণের ঘাড়ে সিন্দবাদের ভূতের মত চেপে বসে থাকা সামরিক জান্তার দুঃশাসনের বিরুদ্ধে এক একটি জ্বলন্ত প্রতিবাদ। প্রত্যেকেই সামরিক বাহিনীতে ছিল, কিন্তু প্রশাসনের একচোখা নীতি আর চরম অবক্ষয় সহ্য করতে না পেরে চাকরি ছেড়ে পালিয়ে এসেছে, গড়ে তুলেছে এই সংগঠন। সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে সামরিক জান্তাকে একদিন না একদিন ক্ষমতা ছেড়ে সরে যেতে বাধ্য করবে এরা। এটাই মুখ্য উদ্দেশ্য এই সংগঠনের।'

'খুব চমৎকার ইংরেজি বলেন আপনি,' প্রসঙ্গ পাল্টাল মাসুদ রানা।

'কোথায় পড়াশুনা করছেন?'

'ধন্যবাদ। কেমব্রিজে। আগে কিছুদিন বৈরুতের আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতেও ছিলাম,' হাই তুলল জিনিয়া।

'ঘুম পায়?'

'এরকম নাইট জার্নি করিনি কখনও। টায়ার্ড লাগছে খুব।'

একটা কম্বল তুলে ওর পিঠের নিচে গুঁজে দিল রানা। 'চোখ বুজে রেস্ট নিন, ভাল লাগবে।'

'ধন্যবাদ,' পা লম্বা করে বসল জিনিয়া ক্যাবের সাথে হেলান দিয়ে। প্রায় সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘন্টায় গড়ে প্রায় একশো কিলোমিটার বেগে ছুটছে ট্রাক। এর মধ্যে কোন গার্ড পোস্টের মুখোমুখি হতে হয়নি, এগিয়ে চলেছে নির্বিঘ্নে। ঘড়ি দেখল রানা, তিনটে দশ। একের পর এক সিগারেট ধ্বংস করে চলেছে ও। অনবরত ঝাঁকি খেতে খেতে গরিলাও বোধহয় কাহিল হয়ে পড়েছে। সামান্য পিছিয়ে গিয়ে ক্যারিয়ার বোর্ডের সাথে কাত হয়ে হেলান দিয়ে বসল সে। ঝিমুতে শুরু করল।

ঘুমের ভেতর রানার দিকে হেলে পড়েছে জিনিয়া। মাথাটা ঠেকে আছে ওর কাঁধে। ওর মধ্যেই পা ভাঁজ করে গুটিসুটি মেরে শুলো সে বাচ্চা মেয়ের মত, দুহাত ভরে দিয়েছে দুই উরুর মাঝখানে। কিন্তু গাড়ির ঝাঁকিতে বারবার ওর মাথাটা নেমে আসছে। বাধ্য হয়ে বাঁ হাত তার ঘাড়ের পিছন দিয়ে ঘুরিয়ে ওপাশে নিয়ে মাথাটা আলতো করে ধরে রাখল রানা। ওর গালের সাথে ঠেকে আছে এখন মেয়েটার মসৃণ কপাল। তার চুলের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছে রানা।

অন্ধকার কেটে যেতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। একটু একটু করে ফুটতে শুরু করেছে দিনের আলো। রেঙ্গুন থেকে কম করেও একশো আশি মাইল উত্তর পশ্চিমে সরে এসেছে ওরা, আন্দাজ করল রানা। চারদিকে কেবল পাহাড় আর জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ছুটছে তো ছুটছেই। পাকা রাস্তা ছেড়ে আবার মেঠো রাস্তায় নেমে পড়ল ট্রাক।

চারদিক আরও খানিকটা ফর্সা হতে চোখ মেলল জিনিয়া। পিটপিট করে চাইল প্রথমে। সামনেই গিজগিজে দাড়িভর্তি রানার থুতনি দেখে তড়াক করে সিধে হয়ে বসল, বড় বড় হয়ে উঠেছে দু চোখ।

'আমি···আমি দুঃখিত,' প্রায় অচেনা-অজানা এক যুবকের কাঁধে মাথা রেখে এতক্ষণ ঘুমিয়েছিল ভেবে আরক্ত হয়ে উঠল জিনিয়া। 'সত্যি···।'

মুচকে হাসল রানা। 'কিছুই মনে করিনি আমি, বিলিভ মি।'

আঙুল দিয়ে চিরুনি বোলানোর মত করে টেনে টেনে চুলগুলো মোটামুটি ঠিক করে নিল মেয়েটা। হাত তুলে ঘড়ি দেখল। 'বাবা! এতক্ষণ ঘুমিয়েছি?'

পুব আকাশে, অনেক উঁচুতে স্থির হয়ে আছে কিছু ছোপ ছোপ মেঘ। রঙ লেগেছে তার গায়ে—সূর্য উঠবে কিছুক্ষণের মধ্যে। ঘুম ভেঙে গেছে এক যুবকের। উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙল সে। ফ্ল্যাপ সরিয়ে উঁকি দিল বাইরে।

সাথে সাথে ঘুম ঘুম আলস্য ভাব উধাও হয়ে গেল তার চেহারা থেকে। পিছন ফিরে জিনিয়ার উদ্দেশে কি যেন বলল যুবক।

'এসে পড়েছি নাকি?' আন্দাজে জিজ্ঞেস করল মাসুদ রানা।

হাসি ফুটেছে জিনিয়ার মুখে। 'হ্যাঁ।'

পাঁচ মিনিট পর সামনে একটা গ্রাম চোখে পড়ল। ছোট ছোট ঘর-বাড়ি। কঠোর দারিদ্র্যের ছাপ ফুটে আছে প্রতিটির গায়ে। দূর থেকে অনেকটা পথ ঘুরে গ্রামটাকে পাশ কাটাল সোলায়মান। আরও মাইল খানেক এগিয়ে একটা বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। চারদিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় প্রাচীন গাছ। ওর ফাঁক ফোকর দিয়ে ডানে-বাঁয়ে এঁকেবেঁকে চলছে ট্রাক। বন ছাড়িয়ে একসময় বেরিয়ে এল অন্য প্রান্ত দিয়ে। দাঁড়িয়ে পড়ল। ঝটাং করে টেইলগেট নামিয়ে দিল যুবক।

'চলুন, নামি,' বলল জিনিয়া।

রানা নামল আগে। ব্যাগটা নামিয়ে রেখে হাত বাড়াল। দুহাতে মেয়েটার ক্ষীণ কটি ধরে আলতো করে নামিয়ে আনল।

'ধন্যবাদ।' আবারও আরক্ত হয়ে উঠল তার দুগাল। রানাকে এক পলক দেখে দ্রুত আরেকদিকে তাকাল।

বেশ উঁচু ছাতওয়ালা খামারবাড়ি দেখা যাচ্ছে একটা। ওটার জীর্ণদশা দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়, পরিত্যক্ত। একদিকে অনেকটা কাত হয়ে আছে। মোটা মোটা দুটো গাছ দিয়ে কোরকমে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে পতনটা। ওটার দুপাশে আরও তিন-চারটে ছোট ছোট ঘর। সবগুলোরই এক অবস্থা। বহু কষ্টে খাড়া রেখেছে নিজেদেরকে। সামনের খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একটা ল্যান্ড রোভার। বার্মিজ আর্মির ছাপ মারা। গাড়ির আওয়াজে খামারবাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন জাহেদ, আর রাশেদ। দুজনের কাঁধেই ঝুলছে একটা করে স্টেন। রানার দিকে একপলক তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিল জাহেদ, জিনিয়াকে জিজ্ঞেস করল, 'পথে কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

'নাহ্।'

'যাক।'

খামারবাড়ির দরজায় দেখা গেল জসিমকে। রানার সাথে চোখাচোখি হতে মৃদু হাসল লোকটা। পাল্টা একটু মুচকি হাসল রানা। একটু এপাশে সরে এসে দাঁড়াল ক্যাপ্টেনের মুখোমুখি। 'আপনার সাথে আমার কিছু জরুরী আলাপ আছে,' বলল ও। চোখ ইশারায় খামারবাড়িটা দেখাল, 'ভেতরে চলুন।'

'কি ব্যাপারে?' রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত নজর বোলাল জাহেদ। কেমন একটু খটকা লাগল মনে, ঠিক অনুরোধ নয়, মনে হলো ওকে যেন নির্দেশ করল লোকটা। চোখমুখের ভাবও যেন কেমন কঠোর লাগছে।

'এখানে নয়,' একই ভঙ্গিতে বলল রানা। 'ভেতরে চলুন।' পা বাড়াল খামারবাড়ির দিকে। ওর পথের ওপর বুক টানটান করে দাঁড়িয়ে আছে

ক্যাপ্টেন। রানাকে এগোতে দেখেও নড়ল না একচুল। দিক বদলাল না রানাও। ভাবল, পথ ছাড়বে না বোধহয় জাহেদ। কিন্তু ধাক্কাটা লাগার ঠিক আগমুহূর্তে, কি ভেবে চট্ করে সরে দাঁড়াল সে ওর পথ থেকে। পাশ কাটিয়ে মাপা, দৃঢ় পায়ে চলে গেল রানা। পিছন থেকে চোখ কুঁচকে ওর দিকে চেয়ে থাকল জাহেদ। বলল, 'যান। আসছি।'

জসিমের পাশ কাটিয়ে ঘরের ভেতরে পা রাখল রানা। চাপা গলায় সতর্ক করল ওকে জসিম। 'ক্যাপ্টেন খুব বদ্‌রাগী, মিস্টার হাসান। রেগে গেলে বোধবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। লোকটাকে না চটানোই ভাল।'

উত্তরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় সামনের জিনিসটার ওপর চোখ পড়তে থেমে গেল রানা। ওপাশের কাঠের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে নড়বড়ে একটা টেবিল। তার ওপর খোলা অবস্থায় আছে জসিমের প্রকাণ্ড রাকস্যাক। ভেতরে কোন ডাক্তারি যন্ত্রপাতি বা ওষুধপত্র কিছু নেই, ওটা আসলে একটা পোর্টেবল রেডিও স্টেশন। দেখামাত্রই চিনেছে রানা, জার্মানির তৈরি অত্যাধুনিক নেভি শোর রিকনাইস্যান্স রিগ ওটা, অত্যন্ত শক্তিশালী—রেঞ্জ হবে কম করেও সাড়ে চারশো মাইল। হ্যান্ডসেট আছে দুটো। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ওটা দিয়ে কথা বলা যায় দুনিয়ার যে কোন প্রান্তের সাথে।

কিছুটা আশ্বস্ত হলো ও জিনিসটা দেখে। এটার সাহায্যে খুব সহজেই যোগাযোগ করা যাবে রেঙ্গুনে। নিজের অপ্রত্যাশিতভাবে গায়েব হয়ে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবে ও কমিউনিকেশন অফিসারকে, সেই সঙ্গে ক্যাপ্টেন জাহেদের মিশনের জটিলতা নিয়েও আলোচনা করা যাবে প্রয়োজনে। ঘুরে জসিমের মুখোমুখি হলো মাসুদ রানা, 'হোয়াট ইজ ইওর রেটিং, সেইলর?'

'তার মানে?' চোখ পিটপিট করল লোকটা কয়েকবার, 'কিসের রেটিং?'

অভিনয়টা একেবারেই কাঁচা। হাসি পেল রানার। 'কামন, জসিম। কোন ন্যাভাল শিপের চীফ রেডিওম্যান ছাড়া এ জিনিস যার-তার কাছে থাকার কথা নয়। ব্যাগের পিছনে রেডক্রিসেন্ট প্রতীক সাঁটা দেখে আমি তো ধরে নিয়েছিলাম আপনি বুঝি মেডিক।'

'নিজেকে কখনও মেডিক বলে দাবি করেছি আমি?'

'না, তা করেননি।'

'হাসান!' বাইরে থেকে হেঁড়ে গলায় ডেকে উঠল জাহেদ, 'বাইরে আসুন, জলদি!'

সাত

বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। সামনের আঙিনায় দাঁড়িয়ে আছে এখনও জাহেদ। গোরাকে দেখা গেল তার সামনে। কিছু একটা যেন ক্যাপ্টেনকে বোঝাবার

চেষ্টা করছে লোকটা। কিন্তু রানাকে বেরিয়ে আসতে দেখে হাতের ঝাপটা মেরে তাকে থামিয়ে দিল সে। চাপা গলায় ধমকে উঠল, 'থামো!'

আশপাশে তাকিয়ে জিনিয়া বা রাশেদকে চোখে পড়ল না কোথাও। গেছে কোথায় সবাই? ক্যাপ্টেনের সামনে এসে দাঁড়াল রানা।

'আমার সাথে আসুন,' বলেই ঘুরে দাঁড়াল জাহেদ। ওপাশের একটা ছোট্ট ঘরে গিয়ে ঢুকল মাথা নিচু করে। পিছন পিছন রানা আর গোরাও এসে দাঁড়াল ভেতরে। যা-তা অবস্থা ঘরটার। দুপাশে খড়ের স্তূপ। কেমন ভেজা ভেজা একটা গন্ধ ভাসছে বাতাসে। টিনের দেয়াল, অসংখ্য ফুটো তাতে। সূর্যের আলো টর্চের ফোকাসের মত ভেতরে ঢুকছে ফুটো দিয়ে।

রানার দিকে কিছুক্ষণ একভাবে চেয়ে থাকল জাহেদ। মুখ দেখে মনে হলো ভাবছে কিছু একটা। হঠাৎ সচকিত হলো সে। ইশারায় পাশেই পড়ে থাকা একটা বড় কাঠের বাক্স দেখিয়ে বলল, 'বসুন।'

বসল না রানা। 'আগে বলুন, আমি···'

বাতাসে বাড়ি মারল জাহেদ। 'পরে। আগে আমার কথা শেষ হোক। কাজে নামার আগে আপনার সাথে বোঝাপড়াটা শেষ করে নিই।'

'দেখুন···'

'অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি,' খেঁকিয়ে উঠল জাহেদ। 'এবার আমার কথা শুনতে হবে আপনাকে। আমার বক্তব্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুখ খুলবেন না, সাবধান করে দিচ্ছি। নইলে, যাতে শুনতে বাধ্য হন, সে ব্যবস্থা করবে গোরা, গোরা!'

'স্যার,' আড়চোখে রানার দিকে তাকাল গোরা এক পলক, এগিয়ে এসে দাঁড়াল ওর পিছনে।

এরপর আর তর্ক চলে না। পরিস্থিতি অনুধাবন করতে দেরি হলো না রানার। নিজেকে সামলাল ও, বলল, 'অলরাইট, গো অ্যাহেড।'

'কাল রাতে গোরার গায়ে হাত তুলেছিলেন আপনি, কেন?' ঠিক প্রশ্ন নয়, অনেকটা অভিযোগের সুরে বলল ক্যাপ্টেন।

'কারণ আমাকে ফোন করতে যেতে বাধা দিয়েছিল ও।'

'ওর ওপর সেরকমই নির্দেশ ছিল আমার। ওর গায়ে হাত তুলে আপনি পরোক্ষে আমার অর্ডারই ভায়োলেট করেছেন। তার মানে সরাসরি আমার নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার স্পর্ধা দেখিয়েছেন। এ পর্যন্ত অনেক ঝামেলা করেছেন আপনি, হাসান। প্লেনে ওঠার পর থেকেই আপনার উল্টোপাল্টা ভাবচক্কর লক্ষ করে আসছি আমি। কেন এসব করছেন, আপনিই জানেন। কিন্তু এই শেষবারের মত হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি আপনাকে, সময় আছে, সতর্ক হয়ে যান এখনও। আর্মি পারসন হলে এতক্ষণে কোর্ট মার্শাল করতাম আপনার, বেঁচে গেলেন সিভিলিয়ান বলে। তাই বলে ভাববেন না পার পেয়ে যাবেন, ওটা ছাড়াও আপনাকে শায়েস্তা করার অন্য হাজারও রাস্তা জানা আছে আমার,' আঙুল তুলে শাসাল সে রানাকে। 'এই মুহূর্ত থেকে, আমার হুকুম ছাড়া একটা পা-ও ফেলবেন না আপনি। দ্যাট'স অ্যান অর্ডার, ক্লীয়ার?'

'পা' ফেক্টলি,' বলল বটে। কিন্তু মনে মনে ঠিক উল্টোটা ভাবছে রানা।

'গুড,' পকেটে হাত ভরে রানার ওয়ালথারটা বের করে আনল জাহেদ। 'এবার বলুন, এটা কার?'

'আমার।'

'কেন?'

'কি কেন?'

জাহেদের দাঁতে দাঁত কাটার কড়মড় আওয়াজ উঠল। 'জানতে চাইছি এই জিনিস আপনার কাছে কেন? এই পিস্তল কি কাজে লাগতে পারে একজন ডাক্তারের?'

'কি বললেন?' প্রায় চমকে উঠল রানা। 'কে বলেছে আমি ডাক্তার?' এটাই! ঠিক এই ব্যাপারটাই কাল থেকে মনে পড়ব পড়ব করছিল ওর। এই রোটরকেসটাই যত নষ্টের মূল। ডাক্তারের ব্যাগ ভেবেই বারবার এটার দিকে চাইছিল জাহেদ অমন করে—তার মানে একজন ডাক্তারের আসার কথা ছিল এদের সাথে।

'কি! আপনি ডাক্তার না?' এক পা এগিয়ে এল জাহেদ ওর দিকে। চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। এমন সময় বাধা পড়ল। রেডিওম্যান এসে দাঁড়িয়েছে দোরগোড়ায়।

'সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন, স্যার। লোটাস ডাকছে আপনাকে,' বলল সে।

'আসছি,' রানার দিকে কিছুক্ষণ আগুন ঝরা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল ক্যাপ্টেন। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আমি না আসা পর্যন্ত এ ঘর থেকে বেরুবেন না। গোরা, থাকো এখানে,' ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সে।

বোকার মত তার পিঠের দিকে চেয়ে থাকল রানা। কেন কে জানে, হঠাৎ করেই চোখের সামনে ভেসে উঠল গতরাতের দুর্ঘটনার দৃশ্যটা। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা, ছায়াছবির মত এই মুহূর্তেই যেন চোখের সামনে একের পর এক ডিগবাজি খাচ্ছে পাজেরো জীপটা। ডাক্তারের গাড়ি ছিল ওটা, ওই ডাক্তারই কি···চিন্তায় বাধা পড়ল ওর।

'আপনি ডাক্তার না?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল গোরা। বেকুব হয়ে গেছে সে-ও। 'চিতা রেসকিউ মিশনের···'

'গোরা!' খামারবাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে হাঁক ছাড়ল ক্যাপ্টেন জাহেদ। দূর থেকে এ ঘরের দোরগোড়ায় রানাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে গেল একটু। দু চোখে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি। মনে হলো ওর দিকে চেয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না রানাকে। যেন কোন ঘোরের মধ্যে রয়েছে, বিড়বিড় করতে করতে এগিয়ে আসছে এদিকে। রানার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল গোরা।

এমন সময় ওপাশের একটা ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল লেফটেন্যান্ট রাশেদ। তার পিছনেই রয়েছে এক বর্মী যুবক। একে আগে দেখেনি রানা। জাহেদকে হাত ধরে একপাশে টেনে নিয়ে গেল রাশেদ, নিচু গলায় কি যেন

বলতে লাগল হড়বড় করে, সেই সাথে বারবার করে সদ্য আসা যুবককে দেখাচ্ছে আঙুল তুলে।

প্রথমে কয়েকবার মাথা ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন জাহেদ। তারপর হঠাৎ করেই যেন সংবিৎ ফিরল তার। রানার মনে হলো রাশেদ তাকে এমন কিছু একটা খবর দিয়েছে যে চমকেই উঠল জাহেদ। চঞ্চল হয়ে উঠল হঠাৎ করে। ব্যস্ত পায়ে ল্যান্ড রোভারটার দিকে দু পা এগিয়ে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল আবার।

মুখ তুলে রানাকে নির্দেশ করে কিছু একটা বলল রাশেদকে। দূর থেকে কিছুই বুঝতে পারছে না রানা, তবে মনে হলো ওকে ঘিরেই হয়তো ঘনিয়ে এসেছে কিছু একটা।

হঠাৎ ক প্টেনের চাপা ধমক কানে এল। 'ডু, হোয়াট আই সে!' রাশেদের উদ্দেশে বলল সে।

এক পা পিছিয়ে এল রাশেদ, তালগাছের কানে কানে বলল কিছু একটা। মাথা দোলাল একটা। পরমুহূর্তে লাফিয়ে জীপে উঠে বসল জাহেদ। পিছনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল রাশেদ, গোরা আর সদ্য আসা যুবক। আবদুর রহমান বসল ড্রাইভিং সীটে। ছোট্ট একটা গর্জন ছেড়ে সামনের দিকে লাফ দিল ল্যান্ড রোভার।

ভুরু কুঁচকে ওটার গমন পথের দিকে চেয়ে থাকল মাসুদ রানা। চিতা? ভাবছে ও, চিতা কে? আচ্ছা!···বিদ্যুৎচমকের মত সম্ভাবনাটা খেলে গেল মাথায়, মেজর জেনারেল ইবরাহিম নন তো? যাঁর কথা বলেছিলেন রাহাত খান? জাহেদ কি তাঁকেই রেসকিউ করতে এসেছে?

ঠিক তাই। ও মাই গড! জেনারেলের মাথার ওপর বিপদ ঘনিয়ে আসছে হয়তো, ক্রিপটোসাইফার মেশিনের অসম্পূর্ণ ডিকোডেড মেসেজ দেখে অনুমান করেছিলেন বৃদ্ধ। আরও আগেই কেন এই সম্ভাবনাটা নিয়ে মাথা ঘামায়নি ও, ভেবে নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল রানা। আর কিছু না হোক, এখানে এসে এ পর্যন্ত যতজনের সাথে আলাপ হয়েছে, বর্মী হলেও তারা সবাই মুসলমান-রোহিঙ্গা, অন্তত এ থেকেও তো ব্যাপারটা আঁচ করতে পারা উচিত ছিল ওর। ইশ!

যেভাবেই হোক, বাংলাদেশ আর্মি ইন্টেলিজেন্সের কাছে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন মেজর জেনারেল, অনুমান করল রানা। যার জন্যে এদেশে আসা এই রেসকিউ মিশনের। কিন্তু···এর মধ্যে ডাক্তারের কি প্রয়োজন ছিল? ভদ্রলোক কি অসুস্থ? তাই যদি হয়, সমূহ বিপদ।

কিন্তু আর্মি ইন্টেলিজেন্স খবর পেল, অথচ বিসিআই কিছু জানল না, কেন? পেয়েছে নিশ্চয়ই, ভাবল রানা, তবে হয়তো একটু দেরিতে। সময়মত দূতাবাসে পৌঁছুতে পারলে এতক্ষণে ঠিকই জেনে যেত ও। কে জানে, রাহাত খান ওর খোঁজে দূতাবাসের সাথে এ পর্যন্ত কতবার যোগাযোগ করেছেন।

জিনিয়ার ওপর চোখ পড়ল রানার। আঙিনায় দাঁড়িয়ে কিছু আলোচনা করছে সোলায়মানের সাথে।

ভুরু কুঁচকে দক্ষিণ-পুব দিগন্তের দিকে চেয়ে আছে মেজর আনোয়ারুল ইসলাম। রাত তিনটের দিকে হঠাৎ করেই থেমে গেছে ঝড়। আকাশে এ মুহূর্তে মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই। কড়া সূর্যের আলোয় কাঁচের মত ঝকঝক করছে বঙ্গোপসাগরের সীমাহীন নীলচে পানি। মসৃণ গতিতে তরতর করে এগিয়ে চলেছে এফ. বি. ওসমানী। ঘড়ি দেখল মেজর—প্রায় নটা।

ঘুরে পিছন দিকে চাইল সে কি মনে হতে। জানে, দিগন্ত রেখার ঠিক ওপাশেই কোথাও রয়েছে বিএনএস শাহজালাল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। ওসমানীর সাথে একই গতিতে আসছে ওটা। চট্টগ্রাম থেকে এর মধ্যে প্রায় দুশো ত্রিশ মাইল দক্ষিণ দক্ষিণ পুবে এসে পড়েছে ওসমানী—অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে বলা চলে। আজ মাঝরাতের কিছু পর পৌঁছুবে গন্তব্যে। অবশ্য তার আগেই আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা ছাড়িয়ে বর্মার জলসীমানায় নাক ঢোকাবে ওসমানী।

কিন্তু ও নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয় মেজর আনোয়ার। সে ভাবছে একটু আগে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, সেখান থেকে বিএনএস শাহজালাল হয়ে আসা মেসেজটার কথা। তাতে বলা হয়েছে, ফ্যালকন মিশনের চার সদস্যই জায়গামত পৌঁছে গেছে জেনে ঢাকা চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন। কারণ, মিশনের অন্যতম সদস্য, ডাক্তার, গতরাতে ঢাকাতেই এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। কাজেই, এ মুহূর্তে ফ্যালকনের সদস্য সংখ্যা চার নয়, তিন হওয়ার কথা।

শেষে মিশন লীডারের উদ্দেশে ঢাকার পরিষ্কার নির্দেশ—বর্তমান ডাক্তার ভুয়া। বিষয়টা তদন্ত করে এ ব্যাপারে যে কোন পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

খুব ভোরে মিশনের পৌঁছুনোর খবর মেজর আনোয়ারই, লোটাস বেজ, রিসিভ করেছিল। সাথে সাথে বি এন এস শাহজালালকে তা জানিয়ে দেয় আনোয়ার। সেখান থেকে চট্টগ্রাম ঘুরে ঢাকা পৌঁছেছে মেসেজ। তার পরপরই এই খবর। কেবল ট্রান্সমিশন শেষ করেছে মেজর। কথা হয়েছে ফ্যালকনের টীম লীডারের সাথে। কে জানে, কি চলছে ওখানে এখন। শেষ পর্যন্ত কি ব্যর্থই হয়ে যাবে মিশন?

কলা, পাঁউরুটি দিয়ে নাশ্‌তা সারল রানা ও জিনিয়া। এরপর টোল পড়া দুটো অ্যালুমিনিয়ামের মগে করে কফি দিয়ে গেল তালগাছ। রানা জানে, বেরিয়ে যাওয়ার আগে অয়্যারলেসে লোটাস নামে কারও সাথে কথা হয়েছে জাহেদের। কিন্তু কি কথা, তা জানা হয়নি। জানে না, সোলায়মানের ওপর নির্দেশ আছে, ওর ওপর কড়া নজর রাখার। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে দেয়া চলবে না। স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে হাসানের সাথে। জিনিয়া অবশ্য এর কিছুই জানে না।

'ওরা সবাই ব্যস্ত হয়ে গেল কোথায়?' কফি শেষ করে সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।

'আশেপাশেই,' বলল জিনিয়া।

'মেজর জেনারেলকে রিসিভ করতে?'

একভাবে কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকল মেয়েটা। তারপর পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আপনি নাকি কিছু জানেন না এ ব্যাপারে?'

'সত্যিই জানি না। তবে অনুমান করছি এখন একটু একটু।'

'অনুমানের সূত্রটা কি জানতে পারি?'

'একটু আগে গোরার মুখে চিতা কথাটা শুনেছি।'

'তাতেই বুঝে ফেললেন চিতা মানে···'

'না, তা নয়। মেজর জেনারেলের নাম শুনেছি আমি আগেই। তিনি বিপদে পড়তে যাচ্ছেন, তা-ও জানি মোটামুটি। তাছাড়া···আপনারাও সবাই মুসলমান, এ থেকেই অনুমান করে নিয়েছি।'

'আচ্ছা।'

'সত্যিই তাহলে ওঁর পিছনে লেগেছে বর্মী জান্তা?'

'আপনি মেজর জেনারেল সম্পর্কে এসব গোপন তথ্য কিভাবে জানলেন?'

'আমাদের ফরেন মিনিস্ট্রির এক হাই অফিশিয়ালের কাছ থেকে।'

'ও,' একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল জিনিয়া। 'শুধু পিছু লাগা নয়, ধরতে পারলেই কোর্ট মার্শাল হবে তাঁর। মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে, ফায়ারিং স্কোয়াডে।'

'কি অপরাধে?'

'রোহিঙ্গাদের ওপর সরকারের নিপীড়নের প্রতিবাদ করার অপরাধে। আপনি জানেন নিশ্চই, বিশেষ করে মুসলমানদের ওপর কি দমনমূলক নির্যাতন চালানো হচ্ছে এদেশে?'

'জানি, কিছু কিছু। খবরের কাগজে দেখি।'

'মুসলমানদের ওপর সও মঙ সরকারের রাগটা কেন যেন একটু বেশিই। অহেতুক ধরপাকড়, নিত্য লুটপাট, অগ্নিসংযোগ আর নারী নির্যাতন, এই নিয়েই আছি আমরা এ দেশে। এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে আজ এই দশা মেজর জেনারেলের।'

'এর জন্যে একেবারে মৃত্যুদণ্ড?'

'না, ভেতরে আরও ব্যাপার আছে। আকিয়াবের জঙ্গলে রোহিঙ্গাদের গোপন এক সামরিক ঘাঁটি আছে। খুবই শক্ত ঘাঁটি, লেটেস্ট মডেলের সব সমরাস্ত্র আছে ওখানে। পর পর কয়েকবার ওই ঘাঁটি আক্রমণ করতে গিয়ে বর্মী সেনাবাহিনীকে চরম ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে, পাল্টা মার খেয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে। এসব কৃতিত্বের দাবিদার এই মেজর জেনারেলই। আর্মি রেইড হওয়ার আগে প্রতিবারই গোপনে সংবাদ পাঠাতেন তিনি আকিয়াবে। ফলে পুরো প্রস্তুতি নিয়ে থাকত রোহিঙ্গা যোদ্ধারা। গেলেই মার খেত সেনাবাহিনী।'

'তিনি কি করে বুঝতেন ওখানে হামলা চালাতে যাচ্ছে সরকার? উনি মুসলমান, মেজর জেনারেলই হোন, আর যা-ই হোন, নিশ্চই খবরটা গোপন রাখা হত তাঁর কাছে?'

'আর্টিলারি চীফ ছিলেন মেজর জেনারেল। যখনই বড় ধরনের কোন আর্টিলারি ডেসপ্যাচের নির্দেশ আসত, তখনই সতর্ক হয়ে যেতেন তিনি, খবর পাঠাতেন ওখানে। তবে, প্রত্যেকবারই মুসলমানদের ঘাঁটিতেই যে হামলা করত ওরা, তা-ও নয়। কখনও কখনও খৃষ্টান কারেনদের ওপরও চড়াও হয়েছে। কিন্তু ডেসপ্যাচ অর্ডার পাওয়া মাত্র সংবাদটা আকিয়াবে পাঠাতে দেরি করতেন না তিনি কখনও। তিন সপ্তা আগে ব্যাপারটা বর্মী আর্মি ইন্টেলিজেন্সের চীফ, উ ক মঙ টের পেয়ে যায় কিভাবে যেন। সে যে জেনে গেছে, চিতাও তা বুঝে ফেলেছিলেন। সাথে সাথে গা ঢাকা দেন তিনি। অবশ্য ব্যাপারটা এখনও গোপন রেখেছে সরকার, ফাঁস হয়ে গেলে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পড়তে হতে পারে রেঙ্গুনকে। দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই এখন তাঁর।'

হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল রানা, 'কিন্তু আপনি এসবের মধ্যে কেন? মেজর জেনারেল···'

'আমার বাবা।'

'তাই বলুন।' কী যেন ভাবল একটু রানা, আনমনে টং টং টোকা মারছে মগের গায়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে। চোখ ঝলসে গেল কড়া রোদে। গত তিন দিন সূর্যের মুখ দেখা যায়নি ঢাকায়। হঠাৎ করে আজ খুব কড়া লাগছে তাই রোদের তেজ। 'আপনার বাবা কি অসুস্থ?'

'হ্যাঁ। প্রেশার আছে, হাই। দুবার স্ট্রোক হয়েছে আগে। দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগে প্রেশার আরও বেড়ে গেছে।'

'দেশ ছেড়ে পালানোর কি দরকার আপনার বাবার? আকিয়াবের ঘাঁটিতে চলে গেলেই তো পারেন।'

'সম্ভব নয়। অনেকদূরের পথ। নির্ঘাত ধরা পড়ে যাবেন। চারদিকে ঘুরঘুর করছে কর্নেল মঙের চর।'

'আপনার আর কে কে আছে?'

'দুই ভাই আছে, বড়। দুজনেই লন্ডনে। বিয়ে করে সংসারী হয়েছে ওদেশে।'

'মা?'

'নেই। দুবছর হতে চলল মারা গেছেন।'

'কর্নেল মঙ যদি আপনাদের এসব তৎপরতা টের পেয়ে যায় কোনভাবে···'

'যদি নয়। পেয়ে গেছে অলরেডি।'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। 'কি করে বুঝলেন?'

'একটু আগে এক যুবক এসেছিল, দেখেছেন তাকে?'

'দেখেছি।'

'ও আমাদের ইনফরমার। এসে বলল, সাত-আট মাইল উত্তরের একটা গ্রামে নাকি সাদা পোশাকধারী কয়েকজনকে দেখা গেছে। আচরণ সন্দেহজনক, এদিকেই নাকি আসছে। ব্যাপারটা যাচাই করে দেখতে গেছে

ওরা সবাই। তবে···ঠিক এদিকেই কেন আসছে ব্যাটারা, বুঝতে পারছি না।' একটু দ্বিধান্বিত মনে হলো জিনিয়াকে।

'আপনার সঙ্গীরা কতটা বিশ্বাসী?'

'এদের সবাইকে আমি চিনিও না। তবে লেফটেন্যান্ট রাশেদ যখন এদেরকে সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করেছে, তখন এদের সততা নিয়ে কোন সন্দেহই নেই আমার।'

'মানব চরিত্র বড় জটিল···,' থেমে গেল মাসুদ রানা। চিন্তিত। 'আচ্ছা, কাল রাশেদ বলছিল, কোথায় নাকি আর্মি ঘুর ঘুর করছিল। ব্যাপারটা কি?'

'এয়ারপোর্ট থেকে এসে প্রথমে যে বাড়িতে ঢুকেছিলেন আপনারা, ওই বাড়িতে আর্মি রেইড হয়েছিল। বাবার এক বন্ধুর বাড়ি ওটা, ভদ্রলোক ক্রিশ্চান। তাঁর মেয়ে আর আমি একই সাথে কেমব্রিজে পড়ি। দেশে এলে ক্যান্টনমেন্টেই উঠতে হয় আমাকে বাবার কোয়ার্টারে। কিন্তু মুশকিল হলো অতবড় বাড়িতে কারও সঙ্গে যে কথা বলে দুদণ্ড সময় কাটাব, তেমন কেউই নেই। বাবাকে তো প্রায় সারাদিনই ব্যস্ত থাকতে হয় অফিসের কাজে। এবার তাই বাবার বুদ্ধিতে ওই বাড়িতেই উঠেছিলাম কয়েকদিনের জন্যে।

'উনি অবশ্য এবার দেশে আসতেই বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন ইংল্যান্ডে ভাইদের ওখানে ছুটি কাটাতে। কিন্তু পর পর দুটো ভ্যাকেশনে দেশে আসিনি, ছুটি কাটিয়েছি ভাই-ভাবীদের সাথে। এবার আর যেতে মন চাইল না। তাছাড়া বাবাকে কতদিন দেখি না, খুব ইচ্ছে করছিল দেখতে। তাই কোন নিষেধ শুনিনি, চলে এসেছি প্রায় জেদ করেই। আসলে···এখন বুঝি, কেন আসতে নিষেধ করেছিলেন বাবা। উনি চাননি ওনার সাথে আমিও বিপদে পড়ি।'

'ও বাড়িতে যারা ছিল, ধরে নিয়ে গেছে তাদের?'

'ছিল না কেউ। বাবার পরামর্শে গত সপ্তায় নেপাল গেছে ওরা হিমালয় দেখতে।'

'তারপর?'

'আমি দেশে আসার তিন কি চারদিন পর, হঠাৎ করে দুপুরের দিকে অফিস থেকে চলে আসেন বাবা। সঙ্গে লেফটেন্যান্ট রাশেদ, সোলায়মান আর আবদুর রহমান। বললেন, সন্ধের পর পরই ওই বাড়ি ছাড়তে হবে আমাকে। অন্য কোথাও বাসা ভাড়া করছে রাশেদ, সেখানে গিয়ে থাকতে হবে আপাতত কিছুদিন। এরপর বন্ধুর সাথে কি আলাপ হয় বাবার, জানি না। পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়েন বাবা, গা ঢাকা দেন। দশ বারো দিন হয়ে গেল, কোথায় কেমন আছেন তিনি, জানি না।'

কেঁদে ফেলল জিনিয়া। ধরা গলায় বলল, 'বুড়ো মানুষ, তার ওপর হার্টের রোগী। এত উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা নিয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে কত কষ্ট হচ্ছে বেচারার। ঠিকমত খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই···,'

জিনিয়ার মুখের দিকে চেয়ে থাকল রানা। দিনের পর দিন হিংস্র হায়েনার তাড়া খেয়ে ফেরা বৃদ্ধ অসুস্থ পিতার কষ্টের কথা ভেবে কাঁদছে অসহায় মেয়ে,

কি বলে ওকে প্রবোধ দেবে সে? তারচে' বরং কাঁদুক কিছুক্ষণ, মনটা শান্ত হবে তাতে। একসময় নিজেকে সামলে নিল মেয়েটা। চোখ মুছে নিয়ে নড়েচড়ে বসল।

'কোথায় আছেন এখন আপনার বাবা?'

'আমি জানি না। লেফটেন্যান্ট জানেন। তবে আজ রাতে এখানে এসে পৌঁছুবার কথা আছে তাঁর।'

'সঙ্গে লোকজন আছে তো?'

'আছে, সাত আটজন। আরও কিছু আছে, এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে তারা।'

'ঢাকায় সাহায্য চেয়ে পাঠালেন কিভাবে?'

'টেলিফোনে।'

'অ্যাঁ?'

'বাংলাদেশ আর্মি ইন্টেলিজেন্সের চীফ, ব্রিগেডিয়ার খলিল বাবার বন্ধু। বাধ্য হয়ে ওনার কাছেই সাহায্যের আবেদন পাঠিয়েছেন উনি।'

'ওপেন লাইনে?'

'হ্যাঁ।'

'সব্বোনাশ! এমন কাজ···'

'কেন?'

'ওপেন লাইনে কথা বলেছেন···যদি ট্যাপ করা হয়ে থাকে?'

'অবশ্যই ট্যাপ করা হয়েছে। হবে জেনেই তো করা।'

'বুঝলাম না।'

'দুটো প্ল্যান ছিল বাবার। প্রথমটা টেলিফোন করা, যাতে কর্নেল মঙ জানতে পারে উনি কি করতে চাইছেন। কারণ, ওই লোকটার ভয়ে এক জায়গায় বসে থাকতে হচ্ছে এখন বাবাকে, বাইরে বেরুতে পারছেন না। চারদিকে হন্যে হয়ে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে মঙের লেলিয়ে দেয়া চরেরা। পুরো দেশ ছেয়ে গেছে ওয়াচারে। তাই লোকটার নজর ডাইভার্ট করার জন্যেই করা হয়েছে কাজটা। বাবা চেয়েছেন ফোন ট্যাপ করুক মঙ। জানুক, আগামী তিন তারিখে আকিয়াব হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করতে যাচ্ছেন তিনি। এবং তা বিশ্বাস করে বসে থাকুক সে ওখানে গিয়ে। কিন্তু ওই পথে কোনকালেই যাবেন না আসলে তিনি। যাবেন সাগরপথে এবং তিন তারিখের অনেক আগেই। ভেতরের ব্যাপার যখন টের পাবে মঙ, বাবা তখন থাকবেন ওর নাগালের বাইরে।'

'চমৎকার!'

'তবে আমার ধারণা, খুব একটা কাজ হয়নি এসবে।'

'কেন?'

'কাল আপনাদের প্লেনের ওপর নজর রাখার জন্যে এয়ারপোর্টে ওয়াচার পাঠিয়েছিল মঙ। বাবার লোকও ছিল অবশ্য, ওর ব্যবস্থা করে রেখে এসেছে। আজ সন্ধে পর্যন্ত ঘুমুবে ব্যাটা। বাবাকে একদম দেখতে পারে না মঙ

হারামজাদা। বাবার ট্যালেন্টকে সহ্য করতে পারে না।'

'কি রকম?'

'একবার গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেলের মাদক সম্রাটদের পোষা বাহিনীর বিরুদ্ধে বড় রকম একটা অভিযান চালানোর প্ল্যান করেছিল লোকটা। ক্ষমতা দখল করার পর সও মঙই দিয়েছিল এ নির্দেশ। জনগণকে আসলে বোঝাতে চাইছিল, আমি ভাল মানুষ। কিন্তু প্ল্যানে দুটো বড়রকম ট্যাকটিক্যাল ভুল ছিল মঙের। ভুল দুটো ধরিয়ে দিয়েছিলেন বাবা। যদিও মুসলমান হিসেবে পাত্তা পাননি, তাছাড়া সও মঙের কাজিন হয় উ ক মঙ, প্রভাব খাটিয়ে ওই প্ল্যান মাফিকই হামলা চালায় সে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেলে। এবং ওই দুটো ভুলের জন্যেই চরম মার খেয়ে ফিরে আসতে হয় সেবার সেনাবাহিনীকে। ওই থেকে একেবারে মহা খাপ্পা লোকটা বাবার ওপর। এইবার উঠেপড়ে লেগেছে সুযোগ পেয়ে।'

চুপ করে থাকল রানা। ভাবছে, কি করে মেজর জেনারেলকে বের করে নিয়ে যাবে জাহেদ। কোন্‌খান দিয়ে সীমানা পেরুবে। হঠাৎ গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। একটু পরই সামনের আঙিনায় এসে থামল ল্যান্ড রোভারটা। গাড়ি থেকে নেমে হন হন করে খামারবাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকল ক্যাপ্টেন।

'চিতা কি, কোন খেতাব?'

'হ্যাঁ, সরকার দিয়েছিল বাবাকে।'

আট

আগের রাতের ঘটনা। প্রায় দু ঘণ্টার অক্লান্ত পরিশ্রম শেষে স্বাভাবিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আবার চালু করা সম্ভব হয়েছে মিঙ্গালাদনে। গোলমালটা কোথায় ছিল, কেন বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটল, এখনও ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছে না ডিউটিরত ইলেকট্রিক্যাল এনজিনিয়ার।

ওদিকে বিদ্যুৎ চালু হবার পর পরই ক্যাফেটেরিয়ায় আবিষ্কৃত হয়েছে উইনের অজ্ঞান দেহ। এয়ারপোর্টের ডাক্তার তাকে চেক করে রায় দিয়েছে, খুব কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ ইনজেক্ট করা হয়েছে দেহে। ব্যাপারটা কেমন সন্দেহজনক মনে হলো কর্তৃপক্ষের। বিমান বাংলাদেশের ফ্লাইটটা অবতরণ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই পর পর কয়েকটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে গেছে। অথচ এসব ঘটার পিছনে কোন সঙ্গত কারণ নেই। এই জন্যেই কি কর্নেল মঙ সতর্ক করে দিয়েছিল আগে থেকে?

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ব্যাপারটা একেবারেই অস্বাভাবিক। মিঙ্গালাদনের ইতিহাসে এটাই এ ধরনের প্রথম ঘটনা। এরপর অজ্ঞান লোকটার ব্যাপারটা, কাউকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে রেখে কার কি লাভ? তার কাছ থেকে কেউ কি কিছু গোপন করতে চেয়েছিল? কিন্তু এর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ

ব্যাপার হচ্ছে বিমানের প্যাসেঞ্জার লিস্টের গড়বড়টা। রেঙ্গুনে নামার কথা আঠারোজন যাত্রীর, অথচ নেমেছে সতেরোজন। হাসান নামের এক যাত্রীর পাত্তা নেই, অথচ তার নামের পাশে টিক্ মার্ক করা আছে। লোকটা ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টধারী। গেল কোথায় লোকটা? নাকি আসেনি? কিন্তু টিক্ মার্ক কেন তাহলে? নাকি বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সুযোগে হাওয়া হয়ে গেছে?

কর্নেল মঙের সাবধানবাণীর কথা মনে আছে কর্মকর্তাদের, বিশেষ করে ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টধারী কেউ থাকলে তার ওপর কড়া নজর রাখার নির্দেশ ছিল তার। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়নি তাদের। বিজি ০৭৬-এর ফ্লাইট পারমিশন স্থগিত রেখে কর্নেল মঙকে টেলিফোন করা হয়েছে। অজ্ঞান উইনকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে হাসপাতালে।

একটা চল্লিশে মিঙ্গালাদন পৌঁছল কর্নেল। প্রথমে কাস্টমস অফিসারদের সাথে কথা বলল সে। এরপর পড়ল ইলেক্ট্রিক্যাল এনজিনিয়ারকে নিয়ে, ধমক ধামক মেরে ট্রাউজার গরম করে ছাড়ল সে লোকটার।

'ডিউটির সময় ঘুমানো হয় পড়ে পড়ে, না? এতবড় একটা কাণ্ড কি করে ঘটে গেল তুমি উপস্থিত থাকতে?'

কোন উত্তর দিল না এনজিনিয়ার। অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে কর্নেলের থুতনির নড়াচড়া দেখতে লাগল।

'রাখো, ব্যবস্থা করছি তোমার। যাও, অপেক্ষা করো বাইরে গিয়ে।'

এরপর ডাক পড়ল বিমানের পাইলট তরিকুল ইসলামের। বেচারা আগেই ঘাবড়ে গিয়েছিল ব্যাপার টের পেয়ে। লিস্টটা জমা দেয়ার আগে যদি একটিবার চোখ বুলিয়ে নিত, তাহলে এ ঝামেলায় পড়তে হত না এখন। দেখা যাচ্ছে, সত্যিই গণ্ডগোল আছে ওটায়। লিস্টেড একজন যাত্রীর খবর নেই কোন, অথচ এমনটা হওয়ার কোন কারণই নেই—তাও মানুষটা ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট হোল্ডার।

তবে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, নিখোঁজ এই যাত্রীটির পাসপোর্ট কিন্তু এ মুহূর্তে তারই পকেটে রয়েছে। টিকেটটাও আছে ওর মধ্যে। তাড়াহুড়ো করে নেমে যাওয়ার সময় ওটা ফেলে গেছে হয়তো ভদ্রলোক, টেরটিও পায়নি কখন পড়ে গেছে পকেট থেকে। ভাগ্যিস গ্যাঙওয়ের মাথায় ওদুটো কুড়িয়ে পেয়েছে এক বিমানবালা, নইলে এদের কারও হাতে পড়লেই হয়েছিল। কিন্তু পাসপোর্ট-টিকেট যার প্লেনে পড়ে থাকল, তার উধাও হয়ে যাওয়ার পিছনে কি এমন কারণ থাকতে পারে, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না তরিকুল ইসলাম। রহস্যটা কি? সত্যি সত্যি হারালে এতক্ষণে কি খোঁজ পড়া উচিত ছিল না জিনিস দুটোর?

বাঘের নজরে তরিকুল ইসলামের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল কর্নেল মঙ। সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন।'

বসল সে। মনে মনে ধন্যবাদ জানাল লোকটাকে। তার বিকট চেহারা দেখে কাঁপুনি উঠে গিয়েছিল হাঁটুতে।

'আপনার সাবমিট করা লিস্ট অনুযায়ী আঠারোজন যাত্রী নামার কথা

রেঙ্গুনে, অথচ নেমেছে সতেরোজন, আরেকজন গেল কোথায়?'

'বলতে পারব না,' গলাটা সামান্য কেঁপে গেল পাইলটের।

'কেন?' সামনে থেকে লিস্ট তুলে নিয়ে তার নাকের সামনে দোলাল কর্নেল। 'এটা ঢাকা এয়ারপোর্টের তৈরি লিস্ট, আপনারও সই আছে এর নিচে।'

'সইটা আসলে একটা প্রসিডিওর আছে বলে করা হয়। কিন্তু পাইলট কখনও যাত্রী গুনে দেখে না।'

'ওইসব আমি বুঝি না। লিস্টে এই হাসান নামটার পাশে টিক্ মার্ক করা আছে, অথচ তার ব্যাপারে আপনি কিছুই জানেন না, এটা কোন কথা হলো? তাও আবার একজন ডিপ্লোম্যাটিক প্যাসেঞ্জার, সাধারণ নয়।'

'হতে পারে, ঢাকা অথরিটি হয়তো ভুল করে টিক্ মার্ক দিয়ে ফেলেছে। পরে হয়তো চেক করে দেখেনি লোকটা সত্যিই উঠল কি না। তবে আমার মনে হয় সে আসেনি। এলে যাবে কোথায়? যারা নামার, তারা সবাই দশ মিনিটের মধ্যেই নেমে গেছে।'

'আপনি জানেন, এই লোক আমার দেশের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যকলাপ ঘটাতে পারে বলে গোপনসূত্রে খবর পেয়েছি আমি?'

'আপনার গোপনসূত্রের খবর আমি কি করে জানব, বলুন?'

'কি?' হুঙ্কার ছাড়ল জলহস্তী। 'ইয়ার্কি হচ্ছে? কার সামনে বসে মুখ নাড়ছেন আপনি, জানেন?'

'আপনি শুধু শুধু আমার ওপর রাগ করছেন, স্যার। আপনার যদি এ ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে, আমাদের রাষ্ট্রদূতকে জানাতে পারেন আপনি। অথবা সরাসরি আমাদের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকেও জানাতে পারেন। আমি একজন পাইলট, স্যার। প্লেন চালাই। ভেতরের প্যাঁচ-ঘোঁচ বুঝি না। বিলিভ মি, স্যার, কিছুই জানি না আমি এ ব্যাপারে।'

রেগে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল কর্নেল। ব্যাপারটা নিয়ে আরেকটু ভাবল, হয়তো ঠিকই বলছে ক্যাপ্টেন লোকটা। লিস্ট অনুযায়ী একজন যাত্রীর খবর নেই, আবার ওদিকে ওয়াচার বলছে, ফোক্সওয়াগেন থেকে সাতজনকে ঢুকতে দেখেছে সে বাড়িটার মধ্যে। আর হাইওয়ে গার্ডপোস্ট বলছে চারজন ছিল ল্যান্ড রোভারে। এর মানেটা কি দাঁড়াল তাহলে? সত্যি সত্যি কতজন এসেছে? দুজন, তিনজন, না চারজন?

লিস্টের ব্যাপারটা তাহলে ভুলই হবে, কাউকে বয়ে নিয়ে গেল আরেক দেশে, অথচ হিসেব মেলাতে পারল না, এমন গাধামী কোন আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা করবে না নিশ্চয়ই। তবে গণ্ডগোল একটা কিছু যে আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নইলে এয়ারপোর্টের কারেন্টও যেত না, আর উইনের···

যদিও ব্যাপারটা প্রমাণ করা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে। এই যা একটু অসুবিধে। যাকগে, যতজনই থাকুক দলে, কোন সমস্যা হবে না ওটা। সময়মত জাল ফেলবে সে, তুলে আনবে ডাঙায় ছোট-বড় সবগুলো মাছ। 'ঠিক আছে,' চোখ তুলল মঙ। 'যেতে পারেন আপনি।'

'আমাকে কি ফ্লাই করার অনুমতি দেয়া হলো?'

'হ্যাঁ, যান।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন। নির্ধারিত সময়ের ঠিক আড়াই ঘণ্টা পর, দুটো পাঁচে মিঙ্গালাদন ত্যাগ করল বিজি ০৭৬।

সকালে অফিসে আসামাত্র মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের কামরায় ডাক পড়ল সোহেলের। বৃদ্ধের চেহারা দেখেই টের পেল ও, কোথাও কোন গোলমাল হয়ে গেছে। তাঁর কপালের পাশে তিরতির করে কাঁপছে একটা শিরা। ঘন ঘন টান দিয়ে চলেছেন পাইপে, অথচ ধোঁয়া বেরুচ্ছে না। অর্থাৎ ওটা ধরানোর কথা বেমালুম ভুলে বসে আছেন।

দুজনের আলোচনাটা খুবই সংক্ষিপ্ত হলো। সবশেষে সোহেলকে নির্দেশ দিলেন রাহাত খান, 'এখুনি একবার এয়ারপোর্টে যাও তুমি। প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখবে আগে, মাইগ্রেট করেছে কিনা রানা। তারপর অফিশিয়ালদের সাথে কথা বলবে। আমি আরেকবার রেঙ্গুনের সাথে কথা বলে দেখি। যাও।'

'জ্বি, স্যার,' তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সোহেল। প্রায় ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে। কোটের একটা হাত দুলছে ওর হাঁটার ছন্দে। অন্যটা স্থির হয়ে আছে—একটা হাত নেই সোহেলের।

'আর কোন মেসেজ দিয়েছে লোটাস?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রেডিওম্যান। 'না, ক্যাপ্টেন।'

'হুঁম!' কপাল কুঁচকে জুতোর ডগার দিকে চেয়ে থাকল জাহেদ কিছুক্ষণ। কি এক দুশ্চিন্তায় চোখমুখ শুকিয়ে গেছে। বাইরে থেকে ফিরেছে সে এইমাত্র। আট মাইল উত্তরের এক পাহাড়ী গ্রামে কিছু সন্দেহজনক লোককে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে, রাশেদের এক ওয়াচারের মুখে এই খবর পেয়ে সদলবলে ছুটে গিয়েছিল সে ওখানে। চারজন ছিল তারা—জেরা করার জন্যে ধরে এনেছে লোকগুলোকে লেফটেন্যান্ট রাশেদ।

ঘুরে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন। রাশেদের উদ্দেশে বলল, 'এখনই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাই আমি। একসাথে ঘরের-বাইরের এত ঝামেলা সামলানো সম্ভব নয়।'

'আপনি যা ভাল বোঝেন, ক্যাপ্টেন,' বলল রাশেদ। 'তবে আরেকটু দেরি করে যদি···'

'ঢাকার মেসেজ তো শুনলেন, এরপর আর দেরি করা সম্ভব নয়। চলুন, ওর মুখ থেকেই শুনব এখন,' দরজার দিকে পা বাড়াল জাহেদ।

ওদের ফিরে আসতে দেখে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে মাসুদ রানা। জানে, সময় উপস্থিত। বাইরে বেরুবার আগে জাহেদ জেনে গেছে যে ও আসলে ডাক্তার নয়। এখন দেখা যাক, কি প্রতিক্রিয়া হয়। বাক্সটার গায়ে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল ও, ঘুরে জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠিটা দরজা দিয়ে

বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েও থেমে গেল। দু কোমরে হাত রেখে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন, সেই অসহিষ্ণু, উদ্ধত ভঙ্গি। দু চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছে যেন। তার পিছনে রাশেদ, গোরা, সোলায়মানসহ আরও কে কে যেন আছে। ক্যাপ্টেনের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে রানাকে।

'কে তুমি?' হিস্ হিস্ করে উঠল ক্যাপ্টেন।

চোখেমুখে একটা ড্যাম কেয়ার ভাব রানার। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'যাক, ভুলটা ভেঙেছে তাহলে!'

'অনর্থক সময় নষ্ট করছ আমার। এখনও ভালভাবে জানতে চাইছি, উত্তর দাও।'

লম্বা করে দম নিল রানা, উঠে জাহেদের মুখোমুখি হলো। তার ঠিক পিছনেই জিনিয়ার সুন্দর মুখটার ওপর চোখ পড়ল, চাউনি আগের মত নেই মেয়েটার, পাল্টে গেছে কেমন যেন। 'সময়ের কথা যদি ওঠে, তো আমি নই, বরং তুমিই আমার সময় নষ্ট করেছ, জাহেদ।'

থমকে গেল জাহেদ, চট্ করে ভুরু কুঁচকে উঠল। বোঝা গেল রানার মুখ থেকে তুমি শুনতে হবে, এটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না একেবারেই। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সে, সেই সাথে শুধরে নিল সম্বোধনটাও। 'সোজাসুজি উত্তর দিন, কেন মিথ্যে ডাক্তার সেজে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করলেন?'

'ওটা আপনার বোঝার ভুল। আমি বরং বারবার সতর্ক করেছি আপনাকে।'

'বাজে কথা বলে পার পাবেন না। আপনি বলেছেন, আপনি হাসান, বলেননি?'

'হ্যাঁ, বলেছি। এখনও বলছি আমি হাসান।'

'মানে হচ্ছে, আপনি মাহমুদুল হাসান, অথচ ডাক্তার নন, এই তো?'

'হ্যাঁ, তাই। আমি ডাক্তার নই, এবং মাহমুদুল হাসানও নই।'

'কি!' এক পা এগিয়ে এল জাহেদ। 'কি বললেন?'

'আমি মাহবুবুল হাসান,' বলেই বুঝল, একটু আগের সেই আত্মবিশ্বাসী ভাবটা পলকে উধাও হয়ে গেছে ক্যাপ্টেনের। 'এবং আমি ডাক্তার নই। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, আপনার সেই ডাক্তার কেন ফ্লাইট মিস করেছে, আমি জানি।'

চোখ ছোট হয়ে এল ক্যাপ্টেনের। প্রশ্নটা অজান্তেই বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে, 'কেন?'

'এয়ারপোর্টে আসার পথে একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে সে।'

'কি করে জানলেন আপনি?'

পাজেরো জীপটার দুর্ঘটনায় পড়ার আগে-পরের ঘটনা সংক্ষেপে বলল রানা। সেই সাথে যোগ করল, 'পিছন থেকে হর্ন না বাজালে হয়তো ফিরে চাইতাম না আমি, সেক্ষেত্রে ওটার উইন্ডশীল্ডের রেড ক্রিসেন্ট প্রতীকটাও দেখতে পেতাম না। ভেজা রাস্তায় ওটার দ্রুত ছোটা দেখে ভেবেছিলাম

হয়তো কোন সিরিয়াস রোগী দেখতে যাচ্ছে ডাক্তার। কিন্তু পরে বুঝলাম, আসলে প্লেন মিস্ করার আশঙ্কাতেই…'

'পরে বুঝলেন মানে? কখন বুঝলেন?'

'আপনি বাইরে যাওয়ার একটু আগে, যখন বললেন একজন ডাক্তারের পিস্তলের কি প্রয়োজন, তখন। তার আগ পর্যন্ত আপনার রেডিওম্যানকেই ডাক্তার বলে জানতাম।'

কিছুক্ষণ গুম মেরে থাকল ক্যাপ্টেন। মাথাটা সামান্য কাত করে নিষ্পলক চেয়ে থাকল ওর দিকে। 'মানলাম, না হয় আমার ভুলই হয়েছে। কিন্তু আপনি যে নিজেকে মাহবুবুল হাসান বলে দাবি করছেন, প্রমাণ করতে পারবেন তা?'

'কি করে? পাসপোর্ট টিকেট থাকলে তো! তাছাড়া আপনি যাকে আশা করছিলেন, আমি সে নই, এটুকুই তো আপনার জন্যে যথেষ্ট।'

'তাই ভাবছেন বুঝি?' টিটকিরির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল জাহেদ, 'তাতেই সব সমাধান হয়ে গেল?'

'কি! বুঝলাম না।'

'টিকেট পাসপোর্ট হারানোর ব্যাপারটা আদৌ সত্যি কি না, আমি জানি? আপনি বলেছেন, শুনেছি। ভেতরে কি আছে কে জানে?'

'কি থাকতে পারে বলে ভাবছেন আপনি?' সিগারেটের অবশিষ্টাংশ মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল রানা। কপাল কুঁচকে চেয়ে আছে ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে।

'কেন এসেছেন এদেশে?'

'কি?'

'এদেশে কেন এসেছেন? মৃত ডাক্তারের ব্যাগটা আপনার হাতে কেন? কিভাবে হাতালেন ওটা?'

চরম বিরক্তিতে রানার চোখমুখ কুঁচকে উঠল। 'মর জ্বালা! স্ক্রু সবগুলো ঠিক আছে তো আপনার আপার চেম্বারে?'

কিন্তু জাহেদ মোটেই রাগল না। আগের মতই একঘেয়ে সুরে বলল, 'ডাক্তার ছাড়া আর কেউ ব্যবহার করে না ওই ব্যাগ।'

'করে না বলে যে কখনও করা যাবে না, এমন কোন নিষেধাজ্ঞাও তো নেই।'

'ঠিক ওই ধরনেরই ব্যাগ ব্যবহারের কি এমন প্রয়োজন পড়ল আপনার? কি আছে ওতে?'

'ওর মধ্যে…,' রাশেদের ওপর নজর যেতে থেমে গেল রানা।

'হ্যাঁ, কি আছে ওর মধ্যে?'

'একটা বিশেষ আইটেম।'

'আমিও তাই জানতে চাইছি, আইটেমটা কি?'

'আমাদের রেঙ্গুন এমব্যাসির কমিউনিকেশন সেকশনের একটা মেশিনের পার্ট। হাইলি ক্লাসিফায়েড।'

'বিশ্বাস করলাম না।'

'বেশ তো। সঙ্গে যখন অয়্যারলেস সেট আছেই, ওদের সাথে যোগাযোগ করলেই জানতে পারবেন সত্যি কি মিথ্যে।'

'জানা হয়ে গেছে,' ক্রূর এক চিলতে হাসি ফুটল জাহেদের ঠোঁটের কোণে।

'মানে?'

'আপনার দাবি যদি সত্যিই হত, প্লেনে বসেই পাসপোর্টটা কেন দেখালেন না? কেন তখনই ভুলটা ভাঙিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেননি আমার?'

'অনেকবার চেষ্টা করেছি, কোন কথাই কানে তোলেননি আপনি,' এক পা এগোল রানা। 'চলুন, আমি নিজে যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছি আপনাকে এমব্যাসির সাথে।'

'দাঁড়ান, অত ব্যস্ত হবেন না,' সন্দেহের মেঘ আরও ঘনীভূত হলো ক্যাপ্টেনের মুখে। 'অয়্যারলেসে কিভাবে কথা বলতে হয় জানেন আপনি?'

রাগে দাঁতে দাঁত ঘষল রানা, ক্যাপ্টেনের সবজান্তা ভাব দেখে পিত্তি জ্বলে গেল। 'আপনি নিজেই অহেতুক সময় নষ্ট করছেন। কথা না পেঁচিয়ে যান, কথা বলুন রেঙ্গুনের সাথে। বলবেন, আমি হাসান, স্পেশাল কুরিয়ার, ক্যারিইং রোটর প্লেট ফর ক্রিপটোসাইফার মেশিন।'

'ক্রিপটোসাইফার!' ভুরু নাচাল জাহেদ, 'সেটা কি?'

'আপনি চিনবেন না। নামও শোনেননি কোনদিন।'

'ভেরি স্মার্ট,' বিড়বিড় করে বলল ক্যাপ্টেন। পিছন ফিরে হাঁক ছাড়ল, 'জসিম!'

দরজার বাইরেই ছিল লোকটা। 'জ্বি, ক্যাপ্টেন।'

'রেঙ্গুনের সাথে কথা বলুন।'

'কিন্তু···স্যার···'

'জানি, রেডিও সাইলেন্স পিরিয়ড চলছে। কিন্তু উপায় নেই, কথা বলতেই হবে। ইমারজেন্সি ফ্রিকোয়েন্সিতে কথা বলুন। লাগলে র‍্যামরড রিমোটও ব্যবহার করতে পারেন। জিজ্ঞেস করবেন, হাসান নামে কারও ঢাকা থেকে আসার কথা ছিল কিনা একটা মেশিনের পার্ট নিয়ে।'

'রাইট, ক্যাপ্টেন,' ছুটল জসিম।

ঠিক দু মিনিটের মাথায় ফিরে এল লোকটা। দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকল আড়ষ্ট ভঙ্গিতে।

'ওয়েল,' তার দিকে চেয়ে আছে জাহেদ। 'কথা হলো?'

শূন্য দৃষ্টিতে রানার মাথার ওপর দিয়ে পিছনের দেয়াল দেখছে রেডিওম্যান। 'জ্বি।'

'কি বলে?'

'বলে এ ব্যাপারে তাদের কিছু জানা নেই।'

তাজ্জব হয়ে গেল রানা উত্তর শুনে। বলে কি! জানা নেই মানে? রাহাত খান খবর দেননি ওদের? জিজ্ঞেস করল ও, 'কার সাথে কথা বলেছেন? কমিউনিকেশন অফিসারকে জিজ্ঞেস করুন।'

'ওনাকে পাইনি। ওনার সহকারীর সাথে কথা হয়েছে।'

'সে হয়তো জানে না,' বলল বটে রানা, কিন্তু আগের মত জোর পেল না গলায়।

আচমকা বিস্ফোরিত হলো ক্যাপ্টেন। 'ইউ ডার্টি লায়ার! তোমার তাই মনে হচ্ছে, না? ভেবেছিলে ডাক্তারকে খুন করে নকল ডাক্তার সেজে আমার মিশন স্যাবোটাজ করবে? ভণ্ডুল করে দেবে সব?' ঝট্ করে পুলিস স্পেশালটা বের করল সে।

'থামুন!' শান্ত গলায় বলল রানা। 'পাগলের প্রলাপ বকছেন আপনি। ব্রিগেডিয়ার জলিল কি দেখে আপনার ওপর এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা মিশনের ভার দিল, বুঝতে পারছি না।'

'আচ্ছা! ব্রিগেডিয়ারের নামও জানেন দেখছি, বাহ্!'

'হ্যাঁ, জানি। তিনিও খুব ভালই চেনেন আমাকে। যান, এবার তাঁর সাথেই কথা বলুন গিয়ে। বলবেন, আহাম্মকের মত একটা কাজ করেছেন আপনি। বিসিআইয়ের এজেন্ট···'

আর সহ্য করতে পারল না জাহেদ, অস্ত্র উল্টো করে ধরে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার ওপর। ধাঁই করে নামিয়ে আনল ওটা রানার কপাল লক্ষ্য করে। এ ধরনের একটা কিছুর জন্যে মনে মনে তৈরিই ছিল রানা, বাঁ হাত তুলে আঘাতটা ঠেকিয়ে দিল মাঝপথে, সেই সাথে ডান পা ভাঁজ হয়ে বিদ্যুৎগতিতে উঠে গেল ওপরদিকে।

'হুঁক্' করে অপার্থিব একটা গোঙানি বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেনের গলা দিয়ে, অস্ত্র ফেলে দুহাতে দুই উরুর মাঝখানটা চেপে ধরে দড়াম করে আছড়ে পড়ল সে। পাগলের মত রানার পায়ের সামনের মাটি শুঁকতে লাগল। ব্যথায় নীল হয়ে গেছে মুখ, গলার দুপাশের রগ ফুলে উঠেছে। হাঁ করে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করছে।

আর সবাই যেন বজ্রাহত হয়েছে। নড়ছে না কেউ একচুল, সম্মোহিতের মত চেয়ে আছে ক্যাপ্টেনের দিকে। প্রচুর সময় লাগল তার আঘাতটা সামলে নিতে। ব্যথার তীব্রতা কমে আসতে ধীরে ধীরে বাঙ্কটার ওপর উঠে বসল সে হাঁপাতে হাঁপাতে। ঘেমে গোসল হয়ে গেছে। রুমাল বের করে মুখ মুছে নিল জাহেদ। একবারও তাকাচ্ছে না রানার দিকে, ভাব করছে যেন কিছুই হয়নি।

দরজার দিকে ফিরে নরম গলায় ডাকল সে, 'জসিম!'

'জ্বি, স্যার?' ভয়ে ভয়ে এক পা এগোল রেডিওম্যান।

'লোটাসের সাথে যোগাযোগ করুন,' রানার দিকে ফিরল। 'কি বললে চিনবেন চীফ? কোড নম্বর কত?'

'এম আর নাইন, মাসুদ রানা।'

'মাসুদ রানা!' চেহারায় কোন প্রতিক্রিয়া হলো না ক্যাপ্টেনের। 'মাহবুবুল হাসান নয়?'

উত্তর দিল না রানা। অপলক চেয়ে আছে লোকটার দিকে।

'ঠিক আছে,' জসিমকে বলল সে। 'বিগ ব্রাদারকে নামটা কনফার্ম করার

রিকোয়েস্ট করবেন। তাড়াতাড়ি!'

'জ্বি।' সামনে থেকে পালাতে পেরে বেঁচে গেল যেন লোকটা।

ঝুঁকে পায়ের কাছে পড়ে থাকা পুলিস স্পেশালটা তুলে নিল জাহেদ। রুমাল দিয়ে ওটার গায়ে লেগে থাকা ধুলো মুছে নিয়ে বলল, 'জসিমের ফিরতে সময় লাগবে। ততক্ষণ বসে থাকার কোন অর্থ হয় না। ব্যাগটা খুলুন, কি আছে ওতে দেখব আমি।'

মাথা নাড়ল রানা। 'সম্ভব নয়।'

'কি!'

'ব্যাগটায় সেলফ ডেসট্রাক্টিভ বোমা ফিট করা আছে। খুলতে হলে হ্যান্ডেলের দুই জয়েন্টের কাছের দুটো ছিদ্রে দুটো সেফটিপিন ইনসার্ট করতে হয় বোমা ডিজআর্ম করার জন্যে। পিন দুটো খুঁজে পাচ্ছি না। ঢাকায় নেয়া ছাড়া খোলার কোন উপায় নেই ওটা।'

'গোরা!'

ভেতরে ঢুকে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল গরিলা। 'স্যার!'

'ধরো হারামজাদাকে!'

নড়ল না গোরা। আমতা আমতা করতে লাগল। 'স্যার, যদি অপরাধ না নেন, একটা কথা বলতাম, ক্যাপ্টেন।'

রক্তচক্ষু মেলে ওর দিকে চাইল জাহেদ। 'কি কথা?'

'জিনিয়া ম্যাডামের ওখানে ছোট একটা পিন পড়ে থাকতে দেখেছিলাম আমি কার্পেটের ওপর। হাসান সাহেবের অজ্ঞান দেহের পাশেই পড়ে ছিল। পিনের ব্যাপারটা আমার মনে হয় সত্যি হতেও পারে।'

ঘরের চাল উড়ে যাওয়ার জোগাড় হলো ক্যাপ্টেনের তীক্ষ্ণ ধমকে। 'শাট আপ, ইউ ব্লাডি সোয়াইন! আই সে, গ্র্যাব হিম!'

কেঁপে উঠল গোরা, এক লাফে রানার পিছনে এসে দাঁড়াল। দুই বিশাল থাবা দিয়ে চেপে ধরল রানার দুই বাহু। থাবা দিয়ে রোটরকেস তুলে নিয়েছে ততক্ষণে জাহেদ। বাক্সের ওপর ওটা রেখে ঝুঁকে পড়ল তার ওপর। নিজেকে ছাড়াবার জন্যে উন্মত্তের মত টানা-হেঁচড়া শুরু করল রানা, কিন্তু লাভ হলো না। এক চুলও শিথিল হলো না তাতে গরিলার বজ্রমুষ্টি।

'দাঁড়ান!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'খবরদার খুলবেন না ব্যাগ! প্রাণে বাঁচবেন না···।'

পাত্তা দিল না জাহেদ। পকেট থেকে একটা কমান্ডো ছুরি বের করে বাঁ দিকের ল্যাচের ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে জোরে চাড় দিল সে, মট্ করে ভেঙে গেল তালাটা।

'এখনও বলছি ওটা খুলবেন না, জাহেদ!' আতঙ্কে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেছে রানার। ওর ভেতরের বোমাটা কতখানি শক্তিশালী, জানে না ও। ওটা বিস্ফোরিত হলে আশপাশের সবাই মরবে কি না, কে জানে। 'ওর ভেতর কিছু নেই, খালি।'

দ্বিতীয় ল্যাচের ভেতর ছুরি ঢুকিয়ে দিয়েছে ততক্ষণে জাহেদ। থেমে গেল

কথাটা শুনে। 'কিছু নেই মানে?'

'এখন খালি ওটা, তবে সত্যিই রোটর ছিল ভেতরে। এই যে, আমার এই পকেটে আছে ওগুলো।'

ওর কোটের ভেতরের পকেট থেকে দুটো পলিথিনের ছোট্ট প্যাকেট বের করে আনল জাহেদ। খানিক উল্টেপাল্টে দেখল প্যাকেট দুটো। 'এগুলো রোটর?'

'হ্যাঁ।'

'কেস থাকতে আপনার পকেটে কেন এগুলো?'

'প্লেনে ওঠার পর আমার সঙ্গে আপনার গায়েপড়া আচরণ দেখে সন্দেহ হয়েছিল আমার। বারবার ব্যাগটার দিকে চাইছিলেন আপনি, তাই বের করে পকেটে রেখেছিলাম।'

জাহেদের চেহারা দেখে মনে হলো হাসবে কি কাঁদবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। 'সন্দেহ করেছিলেন? আমাকে?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, মানলাম। এখন তাহলে কিছুই নেই এর মধ্যে?'

'না।'

ব্যাগটা উঁচু করে দোলাল ক্যাপ্টেন, 'এত ভারী কেন?'

'কিছু খবরের কাগজ···'

'তাই, না?' রানার চোখে চোখ রেখে ধাঁই করে বাঁ হাতের কিনারা দিয়ে ছুরির বাঁটে মারল জাহেদ। আবার 'মট্' শব্দ উঠল। কিন্তু কোন বিস্ফোরণ ঘটল না। এতক্ষণ ধোঁকা দেয়া হচ্ছিল বুঝতে পেরে বিজয়ীর হাসি ফুটল তার মুখে। রানার চোখ সেঁটে আছে ব্যাগটার ওপর, ভাল মানুষের মত দাঁড়িয়ে আছে ওটা চুপচাপ। কি বলল তাহলে সোহেল? নিজেকে বোকা বোকা লাগল ওর। নিরাপত্তার কথা ভেবে এতক্ষণ খামকাই চেঁচিয়েছে তাহলে ষাঁড়ের মত!

এই সময় ওঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল রেডিওম্যান। দৌড়ে আসছে চেঁচাতে চেঁচাতে, 'স্যার, লোটাস বলছে উনি সত্যিই মাসুদ রানা, বিগ···' মুখের কথা শেষ করতে পারল না লোকটা। দু হাতে টান দিয়ে ব্যাগ খুলে ফেলেছে তখন ক্যাপ্টেন, সাথে সাথে ভেতরে হালকা একটা 'ক্লিক' শব্দ হলো—সার্কিট পুরো হলো ট্রিগারিং মেকানিজমের, পরমুহূর্তেই ঘটল বিস্ফোরণ।

অত্যুজ্জ্বল সাদা একটা আলো বিকট 'হুপ' শব্দে লাফিয়ে উঠে এল ভেতর থেকে, ধাঁধিয়ে দিল সবার চোখ, একই সাথে ছোট ঘরটার মধ্যে দিয়ে বয়ে গেল অসহ্য চামড়াপোড়া এক তাপপ্রবাহ। ঘর ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ক্যাপ্টেন জাহেদ, দুহাতে মুখ চেপে ধরে আছড়ে পড়ল কাত হয়ে। বাক্সটার কোনায় ঠাস্ করে লাগল মাথার একটা পাশ, কিন্তু কোনরকম ব্যথা সে অনুভব করতে পেরেছে বলে মনে হলো না।

ওদিকে, আলোর ঝলকানি চোখে পড়ামাত্র রানাকে ছেড়ে একলাফে

পিছিয়ে গেল গোরা। গুলি খাওয়া বাঘের মত খোলা দরজা লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে লেফটেন্যান্ট রাশেদ, দোরগোড়ায় দাঁড়ানো তিন চারজনকে নিয়ে হুড়মুড় করে আঙিনায় পড়ল গিয়ে সে।

উপুড় হয়ে পড়ে অসহ্য যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে জাহেদ, প্রচণ্ড আক্ষেপে ক্ষণে ক্ষণে আপাদমস্তক ঝাঁকি খাচ্ছে তার ব্যায়ামপুষ্ট সুঠাম দেহ। টলতে টলতে এগোল রানা, প্রথমেই এক লাথিতে দরজা দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিল জ্বলন্ত ব্যাগটা। আশপাশের খড়কুটোয় যেটুকু আগুন লেগেছিল, পা দিয়ে মাড়িয়ে নিভিয়ে ফেলল তা। কিন্তু ব্যাগের আগুন নিভল না, বরং বাড়তে লাগল ক্রমেই। থারমাইট প্লাস্টিক জোড়া পলিউরেথিন কেসটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল দেখতে দেখতে, সেই সাথে ভেতরের কিছু খবরের কাগজও।

ঘুরে জাহেদের দিকে তাকাল ও। মুখ থেকে নিয়ে গলা বুক পুড়ে কালো হয়ে গেছে। চুল ভুরু সব অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন আর জোরে চ্যাঁচাতেও পারছে না লোকটা, ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসছে গলার স্বর। শুধুমাত্র জেদের বশে এভাবে নিজের যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু ডেকে আনল নির্বোধ লোকটা, ভাবল রানা। বিনা চিকিৎসায় সবার অসহায় দৃষ্টির সামনে ধুঁকে ধুঁকে মরতে চলেছে জাহেদ, অথচ করার কিছুই নেই।

নয়

দু হাত এক করে মুঠি পাকিয়ে তার ওপর আলতো করে থুতনি রেখে বসে আছেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। মুখোমুখি বসে আছে সোহেল। 'বুঝলাম,' বললেন বৃদ্ধ। 'কিন্তু তোমার এরকম সন্দেহের কারণ কি?'

ওই দিনের ঢাকার এক ইংরেজি দৈনিক, 'সানলাইট' পত্রিকা তাঁর দিকে এগিয়ে দিল সোহেল। প্রথম পাতায় বড় করে একটা সড়ক দুর্ঘটনার সচিত্র খবর ছাপা হয়েছে। খবরটা পড়লেন মেজর জেনারেল। বলা হয়েছে: গতকাল রাত আনুমানিক পৌনে নটার সময় তেজগাঁও বিজি প্রেস চতুর্থ শ্রেণী স্টাফ কোয়ার্টারের কাছে এক মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ মাহমুদুল হাসান (৩৬) এবং তাঁর গাড়ির ড্রাইভার ঘটনাস্থলেই নিহত হন ইত্যাদি ইত্যাদি।

চোখ তুললেন বৃদ্ধ। 'তারপর?'

'এয়ারপোর্টে গিয়ে যতদূর সম্ভব জানার চেষ্টা করেছি, কিন্তু রাতের শিফটের কোন সিনিয়র অফিশিয়াল না থাকায় বেশ ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে। পরে একজন অফিসারের বাসার ঠিকানা নিয়ে তার সাথে গিয়ে দেখা করি। জিজ্ঞেস করি, কাল রাতের বিজি ০৭৬ ফ্লাইট ঠিকমতই ফ্লাই করেছিল কি না। প্রশ্নটা শুনেই কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল লোকটা। ব্যাপার রহস্যজনক মনে হতে নিজের পরিচয় দিয়ে চেপে ধরলাম তাকে। শেষে

স্বীকার গেল সে, ফ্লাইট কাল সময়মতই টেক অফ করেছে, তবে তার আগে ওটাকে ঘিরে বেশ কিছু রহস্যময় ব্যাপার-স্যাপার ঘটে গেছে।'

'আচ্ছা!'

'জ্বি। কিন্তু আর কিছু জানাতে কিছুতেই রাজি করানো গেল না লোকটাকে। বলল, এ প্রসঙ্গে মুখ খুললে চাকরি চলে যাবে। আমাকে সে বিমানের জি এম অপারেশনের সাথে কথা বলার পরামর্শ দিল। এলাম মতিঝিল। ওখানেও একই ঢাক ঢাক গুড় গুড় অবস্থা। ভদ্রলোকের পরিষ্কার কথা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ ছাড়া জানানো যাবে না কিছুই। পরে ওখান থেকে ফোন করলাম মিনিস্ট্রিতে, মন্ত্রী নিজে তাকে ঘটনা খুলে বলার নির্দেশ দিতে তবে জানলাম ব্যাপারটা। ঘটনা হচ্ছে, বিনা টিকেটে বিনা পাসপোর্টে চারজন যাত্রী যাওয়ার কথা ছিল কাল রেঙ্গুনে, ওই ফ্লাইটে। তাদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে বিমানের কাছে গোপন নির্দেশ আসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের।

'প্রথমে তাদের তিনজন এসে পৌঁছায় এয়ারপোর্টে। অন্যজন পৌঁছায় বিমান ছাড়ার ঠিক দু মিনিট আগে। হাতে একটা ব্রীফকেস আর একটা ব্যাগ ছিল লোকটার। ওই ব্যাগের জন্যে সবাই তাকে ডাক্তার বলে ধরে নেয়। ওখানে কারও কোন বর্ণনা না পেয়ে আবার গেলাম সেই অফিসারের বাসায়। জি এম কে দিয়ে আগেই টেলিফোন করিয়েছিলাম তার বাসায়, যাতে কোন তথ্য আর গোপন না করে লোকটা। শেষের এই লোকের যে বর্ণনা দিল সে, তাতে বুঝলাম এ রানা। ঠিক নটায় প্লেনে উঠেছে রানা। আর···প্রথম তিনজনের মধ্যে একজনের যে বর্ণনা পেয়েছি, তাতে আমি শিওর, লোকটার নাম গোরা, আর্মি ইন্টেলিজেন্সের কমান্ডো গ্রুপের সদস্য। ছোটখাট একটা গরিলা বলা যায় লোকটাকে, স্যার।'

'বুঝলাম,' পাইপটা ধরালেন রাহাত খান। 'কিন্তু রানার নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণ কি? আর এর সাথে এই রিপোর্টেরই বা কি সম্পর্ক?'

'নিহত এই ডাক্তারের নাম মাহমুদুল হাসান, আর রানার ছদ্মনাম ছিল মাহবুবুল হাসান, এই গেল এক পয়েন্ট। দু নম্বর, খুব দ্রুতগতিতে ছুটছিল ডাক্তারের জীপ গাড়ি। তিনদিনের বৃষ্টিভেজা পিচ্ছিল রাস্তায় এত জোরে গাড়ি ছুটিয়ে কোথায় যাচ্ছিল সে? এত কিসের ব্যস্ততা ছিল তার? দুর্ঘটনার সময়টার কথাও এখানে ভেবে দেখতে হবে, স্যার, রাত তখন পোনে নয়টা। আমার ধারণা ওই চার বিনা টিকেটের যাত্রীর শেষজন ছিল এই ডাক্তার। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। প্লেন মিস হতে পারে, এই ভয়েই অমন বিপজ্জনক গতিতে ছুটছিল তার গাড়ি। সম্ভবত, কোন বিশেষ মিশন নিয়ে রেঙ্গুন গেছে ওরা। এমন এক মিশন, যাতে একজন হার্ট স্পেশালিস্টকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এদিকে, প্রথমে তিনজন আগেই পৌঁছেছিল বিমানবন্দরে, অপেক্ষা করছিল তারা বাকি একজনের জন্যে। কিন্তু সময়মত যায়নি সে, তার বদলে গেছে মাসুদ রানা। এইখানটাই ভেবে দেখার মত, ডাক্তার একজন যাওয়ার কথা ছিল মিশনের সাথে, হয়তো তাকে চিনত না অন্য তিনজন, দেখেনি কখনও সামনাসামনি। তাই রানা বিমানে উঠতে ভুল করে ওকেই সেই ডাক্তার বলে ধরে নেয় ওরা।

রানাই ছিল শেষ যাত্রী। অন্যদের মত…,'

একটা হাত তুলে সোহেলকে বাধা দিলেন রাহাত খান। ভুরু কুঁচকে ভাবছেন কিছু একটা। আচমকা প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। 'গুড গড! ওটা আর্মি ইন্টেলিজেন্সেরই মিশন, মেজর জেনারেল ইবরাহিমকে রেসকিউ করতে গেছে ওরা। মনে পড়েছে, ইবরাহিম হার্টের রোগী…অনেকদিন থেকে…জলদি ফোন করো ব্রিগেডিয়ার জলিলকে,' নিজের লাল রঙের বিশেষ টেলিফোন সেটটা এগিয়ে দিলেন বৃদ্ধ সোহেলের দিকে।

দ্রুত ছয়টা পুশ বাটন টিপে রিসিভার ধরে বসে থাকল ও। শাহীনবাগের কথিত সেই শিল্প অধিদফতরের সচিবের টেলিফোন বেজে উঠল ঝন্‌ঝন্ করে। দুবার রিঙ হতে রিসিভার তোলা হলো। একটা পুরুষ কণ্ঠ বলল, 'হ্যালো!'

'দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে,' গম্ভীর গলায় আইডেন্টিফিকেশন কোড আওড়াল সোহেল। 'এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনা করতে চাই। বিগ ব্রাদারকে দিন।'

'কে বলছেন, স্যার?'

'সোহেল আহমেদ, ন্যাশনাল ট্রেডিং কোম্পানি থেকে।'

'একটু ধরুন, প্লীজ,' লাইনে পর পর দুটো 'খুট' আওয়াজ উঠল। তারপরই ভেসে এল ব্রিগেডিয়ার জলিল ওরফে বিগ ব্রাদারের কণ্ঠ, 'হ্যাল্লো, মাই ডিয়ার!'

'স্লামালেকুম। আর কে-র সাথে কথা বলুন।'

রিসিভার সোহেলের হাত থেকে নিয়ে কানে লাগালেন বৃদ্ধ। 'হ্যালো!'

'স্লামালেকুম, স্যার! কেমন আছেন?' ব্রিগেডিয়ারের উল্লসিত গলা শোনা গেল।

'আগে কাজের কথা সেরে নিই, জলিল। কাল রাত নটার ট্রেনে মাহবুবুল হাসান নামে এক ডাক্তারকে আমার দেশের বাড়ি পাঠিয়েছিলাম, আমার বড় ভাইকে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। ভাই হার্টের রোগী। আজ খবর নিয়ে জানলাম পৌঁছায়নি সেখানে ডাক্তার। শুনেছি ওই ট্রেনে তোমার নাকি চার কম্পাউন্ডারের যাওয়ার কথা ছিল, অথচ গেছে তিনজন। মনে হয় ভেতরে কোন প্যাঁচ লেগে গেছে।'

একটু থামলেন রাহাত খান। কিছু বলছেন না ব্রিগেডিয়ার। কেবল তাঁর ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের আওয়াজ পাচ্ছেন তিনি। 'বুঝতে পারছ, কি বলতে চাইছি আমি?'

ও প্রান্তে গায়ের জোরে রিসিভারটা কানের সাথে ঠেসে ধরে আছেন ব্রিগেডিয়ার। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না তাঁর। কারণ একটু আগেই জাহেদকে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি, ওই ডাক্তার ভুয়া।

'জলিল?'

'জ্বি, জ্বি, স্যার! বুঝেছি,' সচকিত হলেন ব্রিগেডিয়ার, 'স্যার, আপনার ওই ডাক্তারের এনলিস্টমেন্ট নাম্বার কত?'

'এম আর নাইন।'

'ওম্ মারে মা, মইচ্ছি!' আতঙ্কে মুখ দিয়ে খাস মাতৃভাষা বেরিয়ে এল ভদ্রলোকের। ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি, 'আপনি ফোন রাখেন, স্যার। আমি নিজেই করব একটু পর···এই মিনিট দশেক পর, কেমন? আমার লোকদের সাথে একটু কথা বলতে হবে। রাখলাম, স্যার,' দড়াম করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন আর্মি ইন্টেলিজেন্স চীফ।

অয়্যারলেস সেটের সামনে মূর্তির মত বসে আছে মেজর আনোয়ারুল ইসলাম। নজর সেঁটে আছে বাল্কহেডের গায়ে। পলক নেই চোখে। এ কী ভেল্‌কি! ভাবছে সে, একবার বলে ডাক্তার লোকটা ভুয়া, যে কোন ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে তার ব্যাপারে। পরমুহূর্তেই বলছে ওই লোক খুবই গুরুত্বপূর্ণ—ঢাকার এক বেসরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নাকি সে, নাম মাসুদ রানা।

সবে ট্রান্সমিশন শেষ করেছে মেজর, ঢাকার বার্তা ফ্যালকনকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। অনেকক্ষণ পর ধ্যানভঙ্গ হলো মেজরের। দেখা যাক, একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবল, আবার কোন্ তেলেসমাতি বার্তা আসে।

ওদিকে 'জননী' আরও আগেই ঢুকে পড়েছে বর্মী জলসীমায়। আকিয়াবের কাছাকাছি অবৈধ মাছ ধরায় ব্যস্ত এখন সে।

এর একটু পর, সাড়ে এগারোটার দিকে রেঙ্গুনের এক হাসপাতালে ঘুম ভাঙল উ উইনের। নানারকম ওষুধ ইনজেক্ট করে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই ঘুম ভাঙানো হলো তার। এবং এর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গতরাতে মিঙ্গালাদনে ঠিক কি ঘটেছিল, জানা হয়ে গেল কর্নেল মঙের।

গায়ের ওপর থেকে আবদুর রহমানকে ঠেলে ফেলে দিয়ে একদৌড়ে ভেতরে এসে দাঁড়াল জিনিয়া। 'ইশ্‌শ্!' সভয়ে দুহাতে চোখ ঢাকল জাহেদের মুখের দিকে তাকিয়ে। তার বুক গলা আর মুখমণ্ডলের এক পরতা চামড়া উঠে গেছে পুরোপুরি—চেহারাটা ভয়ঙ্কর লাগছে।

রানা ঝুঁকে বসে আছে তাকে আঁকড়ে ধরে। পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল ও। 'ফার্স্ট এইড···ফার্স্ট এইড কিট্ আছে?'

'আছে, ট্রাকে,' পিছন ফিরে চেঁচিয়ে কাউকে আনতে বলল সে ওটা। তারপর এগিয়ে এসে হাঁটু মুড়ে বসল রানার পাশে, 'কি অবস্থা···'

ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল আবদুর রহমান। হাঁপাচ্ছে ফোঁস ফোঁস। দু হাতে ছোট একটা কাঠের বাক্স। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়েই চোখ কপালে উঠল তার, ঝট্‌পট্ বাক্সটা খুলে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল জাহেদের সামনে। ভীষণভাবে মোচড় খাচ্ছে তার দেহটা, একনাগাড়ে গোঙাচ্ছে। সামাল দিতে পারছে না রানা।

বাক্সের ভেতর থেকে বড় এক শিশি বের করল আবদুর রহমান। মেটে রঙের ঘন তরল পদার্থ দেখা যাচ্ছে ভেতরে। ডান হাতের তালুতে তার অনেকখানি ঢেলে নিয়ে প্রথমে জাহেদের সারামুখে তেলের মত ডলে ডলে

মাখিয়ে দিল সে।

'কি ওটা?' জানতে চাইল রানা।

লোকটাকে জিজ্ঞেস করে জিনিয়া জেনে নিল প্রথমে, তারপর বলল, 'বুনো লতাপাতার রস দিয়ে তৈরি একটা পেস্ট। কাটা, ছেঁড়া আর পোড়া ঘা-র জন্যে খুব উপকারী।'

সারা বুক আর গলায় পুরু করে মাখিয়ে দেয়া হলো পেস্টটা। এরপর তুলো গজ বের করে তিনজনে মিলে তার গলা আর সারামাথা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিল অদক্ষ হাতে। শুধু দু চোখ আর ঠোঁট উন্মুক্ত থাকল। সবশেষে বুক। প্রচুর সময় লাগল কাজটা সারতে। বাক্সটার মধ্যে হাতড়াল রানা মরফিনের আশায়। কিন্তু নেই ও জিনিস। থাকলে বড় ভাল হত। লোকটাকে এ অসহ্য যন্ত্রণা থেকে খানিকটা হলেও মুক্তি দেয়া যেত।

হঠাৎ নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল জাহেদের। চিত হয়ে চোখ মেলে চেয়ে আছে। ডান হাত তুলে দু চোখ ডলল সে। ওদের চমকে দিয়ে কর্কশ, ফ্যাসফেঁসে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এত ধোঁয়া কেন ঘরের মধ্যে? যাচ্ছে না কেন ধোঁয়া!'

রানার দিকে ফিরল জিনিয়া। বুঝতে পেরেছে, চোখ দুটো তো গেছেই, ভোকাল কর্ডও গেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। এখন আর বিন্দুমাত্র রাগ নেই ওর জাহেদের ওপর, উল্টে বরং মনটা খারাপ হয়ে গেছে। ভাবল, সত্যি সত্যি যদি ডাক্তার হত ও, চেষ্টা করে দেখত বাঁচানো যায় কি না ক্যাপ্টেনকে।

'কি করা যায় বলুন তো?' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলে উঠল রাশেদ। 'ধারেকাছে কোন হাসপাতাল বা তেমন আধুনিক ক্লিনিক, কিছুই নেই। কি করে চিকিৎসা করানো যায়?'

পিছন ফিরল রানা। 'হাসপাতাল কত দূরে?'

'পঞ্চাশ মাইলের কম নয়,' বলল সে। 'ইরাবতির ওপারে।'

'এতদূর! পথে কোন বিপদ আপদ যদি না-ও হয়, রাস্তার যা অবস্থা, গাড়ির ঝাঁকিতেই তো···নাহ্, সম্ভব না।' কি একটু ভাবল রানা। তারপর রাশেদের পাশে দাঁড়ানো রেডিওম্যানের দিকে তাকাল। 'আপনার অপারেশন মনিটরের সঙ্গে কথা বলুন এখনই। ক্যাপ্টেনের অবস্থা খুলে জানান। ইমিডিয়েট হেলপ্ পাঠাতে বলবেন।'

'কিন্তু, আমার মনে হয়···'

কড়া এক ধমক মেরে লোকটাকে থামিয়ে দিল রানা। ভরাট, কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠে বলল, 'আপনার কি মনে হয় তা জানতে চাইনি আমি। আপনাদের টীম লীডার মারা যেতে বসেছে, তার জন্যে সাহায্য দরকার। যান, যা বলছি করুন গিয়ে।'

চোখ নামিয়ে অনবরত গোঙাতে থাকা ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল লোকটা। তারপর ধীরপায়ে হেঁটে চলে গেল।

লেফটেন্যান্টের দিকে ফিরল রানা। 'কি করবেন এখন? আমার মনে হয়

না মিশন চালানো সম্ভব হবে, আপনিও তা বুঝতে পারছেন।' জিনিয়ার উদ্দেশে বলল, 'আপনার কি মনে হয়?'

'বুঝতে পারছি না,' বিড়বিড় করে বলল মেয়েটা। 'বাবাও এসে পড়বেন আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। এদিকে···'

গোঙানি থেমে গেল জাহেদের। কথাগুলো শুনতে পেয়েছে সে। শূন্যে একটা হাত তুলে কিছু ধরতে চাইল, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'মিশন···মিশন চলবে। চলতেই হবে!'

ওর হাতটা ধরল রানা। 'কথা বলবেন না।'

কিন্তু থামল না জাহেদ। শুনতে পায়নি, এমন ভাব করে বলল, 'যে ভাবেই হোক···উদ্ধার করতেই হবে···চিতাকে।'

'খেয়াল রাখুন এর দিকে,' জিনিয়াকে বলল রানা। 'আমি দেখি, কি করছে জসিম।'

খামারবাড়িতে এসে ঢুকল ও। কানে এয়ারফোন লাগিয়ে রেডিও কনসোলের ওপর প্রায় উবু হয়ে আছে লোকটা, টেলিগ্রাফ কী-র ওপর আঙুল। একটা পুশবাটন মাইক্রোফোন 'অন' করে সামনে রাখা। রানা পাশে এসে দাঁড়াতে সোজা হলো সে, এক কানের ইয়ারফোন সরিয়ে বলল, 'লোটাসের কোন সাড়া পাচ্ছি না। দেখি···চেষ্টা করে যাচ্ছি। যতটা সম্ভব কম যোগাযোগ করার নির্দেশ আছে তো!' কথার সাথে আঙুল নেচে বেড়াচ্ছে তার কী-র ওপর। কোড ট্যাপ করছে।

'এটা ইমার্জেন্সি, চীফ,' বলল রানা। 'এক-আধটু অনিয়ম হলেও দোষ দেবে না কেউ আপনাকে।'

'বুঝতে পারছি, স্যার। ওই সমস্যার কথা ভাবছি না আমি। ভাবছি এত ঘন ঘন ট্রান্সমিট করতে হচ্ছে, ধরা না পড়ি আবার। কেউ চাইলে খুব সহজেই স্পট্ করতে পারবে আমাদের, যে কোন সাধারণ ট্রানজিস্টর রিসিভারের সাহায্যেই।'

'বুঝি।' রানার কান এড়াল না জসিমের 'স্যার' সম্বোধনটা। 'রেঙ্গুনের সাথে কথা বলেছিলেন তখন আপনি, না?'

'জ্বি। আমার ওপর রাগ করেননি নিশ্চয়ই?'

'নাহ্। কমিউনিকেশন অফিসারকে পেলে এই ঝামেলায় পড়তে হত না। ঢাকা কি বলল, আমার নাম কনফার্ম···'

হাসল রেডিওম্যান। 'তারচে'ও বেশি করেছে, স্যার। আপনার মিশনের ব্যাপারে প্রয়োজনে সবরকম সহযোগিতা দিতে বলেছে আমাদের। কিন্তু···তার তো বারোটা বেজেই গেছে অলরেডি,' পিছন ফিরে ওঘরের খোলা দরজার দিকে চাইল সে। গলা নামিয়ে বলল, 'ভীষণ বদ্‌রাগী ক্যাপ্টেন লোকটা, তেমনি জেদী। অনর্থক জেদ করে নিজেও মরল, মাঝখান থেকে ফাঁসিয়ে গেল আমাদের।'

'ওটা এখন আর কোন ব্যাপার নয়।'

'তবে হ্যাঁ, এরকম দেশপ্রেমিক মানুষ জীবনে খুব কমই দেখেছি আমি,

স্যার। আর…,' হঠাৎ একটা হাত তুলল জসিম। চুপ থাকতে বলছে। অন্য হাত থেমে গেছে কী-র ওপর। 'লোটাস লাইনে আসছে। আপনি কথা বলবেন, স্যার?' মাইক্রোফোনটা এগিয়ে ধরল সে।

মাথা নাড়ল রানা, 'না। আপনিই বলুন। তবে কিভাবে কি ঘটেছে, ডিটেল বলার দরকার নেই। শুধু জাহেদের অবস্থা জানান। আর মেডিকেল সাহায্য পাঠানো সম্ভব কি না জানুন। মিশনের কি হবে, তাও জিজ্ঞেস করবেন।'

'জ্বি,' সরিয়ে রাখা ইয়ারফোনটা জায়গামত বসিয়ে নিল জসিম।

'আপনার এই লোটাস বেজটা কোথায়?'

'সাগরে, স্যার। বঙ্গোপসাগরে।'

'কোন্ ধরনের শিপ? ন্যাভাল?'

'একটা ডেস্ট্রয়ার, আর দুটো ট্রলার। মাছ ধরার।'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। 'এত!'

'একটা ট্রলার ডিকয়। অন্য দুটো…' আবার হাত তুলল সে, 'এসেছে!'

'কথা বলুন।'

মেজর জেনারেলকে উদ্ধারের অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই করেছেন ব্রিগেডিয়ার জলিল, ভাবল রানা। হয়তো ওই জাহাজেই রয়েছে আর একটা স্ট্যান্ড বাই কনটিনজেন্ট, জাহেদের মিশন কোনও কারণে ব্যর্থ হলে তারা দায়িত্ব নেবে। কিন্তু, যদি না থাকে?

ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে এল রানা। আঙিনা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে কেন? চট্ করে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। রাশেদ সোলায়মান আবদুর রহমান কেউ নেই আশপাশে। ওঘরে শুধু জাহেদ আর জিনিয়াকে দেখা যাচ্ছে। চারদিকে চাইল রানা, এইমাত্র সবাইকে দেখে গেছে ও। গেল কোথায়?

ল্যান্ড রোভারের পিছনের দরজা খোলা দেখা যাচ্ছে। ব্যাপার কি! পায়ে পায়ে ওটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। পিছনে মৃদু খসমস আওয়াজ উঠতে ঘুরে তাকাল। গোরা এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে।

'আর সবাই গেল কোথায়?'

হাত তুলে খামারবাড়ির পিছনের অপেক্ষাকৃত ঘন জঙ্গল দেখাল লোকটা। বলল, 'ওদিকে। যে চার স্পাই ধরে আনা হয়েছে, তাদের জেরা করতে নিয়ে গেছেন লেফটেন্যান্ট রাশেদ।'

'ও।'

ক্যাপ্টেনকে উঠে বাক্সটার গায়ে হেলান দিয়ে বসতে দেখে এগোল রানা। পানি খাওয়াচ্ছে ওকে জিনিয়া। কিন্তু ব্যান্ডেজের জন্যে ঠিকমত খেতে পারছে না সে, বেশিরভাগ পানিই পড়ে যাচ্ছে, ভিজিয়ে দিচ্ছে ব্যান্ডেজ।

'কি বলল লোটাস?' জিজ্ঞেস করল জিনিয়া।

'কথা বলছে জসিম এখনও।'

'আমি…আমি খুব…দুঃখিত, রানা,' ভাঙা ভাঙা গলায় বলল জাহেদ। এখন প্রায় বোঝাই যাচ্ছে না কি বলছে সে, আরও বসে গেছে গলা।

'আপনাকে অবিশ্বাস করে···সত্যিই দুঃখিত!'

'বাদ দিন, যা হওয়ার হয়ে গেছে।' বেরিয়ে গিয়ে একটা কলাপাতা জোগাড় করে নিয়ে এল রানা। ওটার খানিকটা ছিঁড়ে পানের খিলির মত বানিয়ে ধরিয়ে দিল জিনিয়ার হাতে। বলল, 'সরু দিকটা মুখে পুরে ওপর থেকে আস্তে আস্তে পানি ঢালতে থাকুন। যত পারেন, পানি খাওয়ান। ডিহাইড্রেটেড না হয়ে পড়ে।'

ওটা হাতে নিয়ে রানার দিকে চাইল মেয়েটা। 'আমাকেও ক্ষমা করতে হবে, রানা। আমিও আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম।'

'ভুলে যান। অনর্থক ওসব নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। দেখি, জসিমের কথা শেষ হলো কি না।'

ও অর্ধেক আঙিনা পার হওয়ার আগেই খোলা দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল রেডিওম্যান। রানার সাথে চোখাচোখি হতে হাসল।

'কি, হয়ে গেল?'

'জ্বি, স্যার।' এবারের 'স্যার' আরও শ্রদ্ধা মিশিয়ে উচ্চারণ করল সে। 'হয়ে গেছে।'

'কি বলে?'

'ওদের বক্তব্য আগে ক্যাপ্টেনকে জানাতে হবে আমার। উনি রিলে করবেন আপনাকে। আপনি, স্যার, কিছু মাইন্ড···'

'অফ কোর্স নট। গো অ্যাহেড।'

'আপনিও চলুন, মেজর।'

জিজ্ঞাসু নেত্রে জসিমের মুখের দিকে চাইল রানা।

'নাউ আই আন্ডারস্ট্যান্ড, হু ইউ রিয়েলি আ', স্যার। তবে আপনাকে কিছুটা সন্দেহ যে আমি করিনি, তা-ও নয়···'

'যান,' থামিয়ে দিল রানা তাকে। 'মেসেজটা আগে জানিয়ে আসুন গিয়ে ক্যাপ্টেনকে।'

'রাইট, স্যার।'

ভেতরে গিয়ে জাহেদের পাশে বসল জসিম। একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'স্যার, লোটাসের বক্তব্য জানাতে এসেছি আপনাকে। আপনি শুনতে পাচ্ছেন, ক্যাপ্টেন?'

'হ্যাঁ, বলে যান।'

প্রায় ক্ষমা প্রার্থনার সুরে আরম্ভ করল সে। 'কথাটা আপনাকে না বলেও পারছি না···'

'কাট্ ইট! কি বলেছে সোজাসুজি বলুন।'

'বলেছে, এগিয়ে যেতে হবে আমাদের, যে করেই হোক। এ মুহূর্তে কোন সাহায্য করতে পারছে না লোটাস কন্ট্রোল। নিজেদের এক্সপোজ করার ঝুঁকি নেয়া সম্ভব নয় ওদের পক্ষে। তাছাড়া এমনিতেও তাড়াহুড়ো করে প্ল্যান করতে হয়েছে বলে সে ধরনের বিকল্প কোন প্রস্তুতি নেয়া হয়নি। এখন যা করার আমাদেরকেই করতে হবে। আর···।'

'আর কি।'

'বলেছে, আপনি মুভ করতে না পারলে আপনাকে ফেলেই এগোতে হবে আমাদের।'

'ঠিকই আছে,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল জাহেদ। 'এটাই নিয়ম। যাক্‌গে, আর কিছু?'

'প্ল্যানড শিডিউল ছাড়া নতুন করে কন্ট্যাক্ট করতেও নিষেধ করে দিয়েছে। বর্মীরা নাকি একটা আনঅথরাইজড রেডিও ট্রান্সমিশন ধরতে পেরেছে, অবশ্য লোকেট করতে পারেনি। আমাদের রেডিওই হবে ওটা। আর মিস্টার রানার ব্যাপারে···,'

'হ্যাঁ, কি?'

'আমাদের সাথে থাকতে বলা হয়েছে তাঁকে,' ঝুঁকে আরও কিছু বলল লোকটা নিচু গলায়। রানা বা জিনিয়া শুনতে পেল না কিছুই। জসিমের কথা শেষ হতে মুখ তুলে রানার আবছা মুখাবয়বটার দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন চোখ কুঁচকে—দেখতে পাচ্ছে না পরিষ্কার। 'রানা, আপনি শুনেছেন লোটাসের বক্তব্য?'

'শেষেরটুকু বাদে।'

'আপনাকে সম্ভাব্য সবরকম সহায়তা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাদেরকে,' এইটুকু বলেই হাঁপিয়ে গেল সে। ঘন ঘন দম নিতে লাগল। 'জসিম···আপনি···আপনি বলুন।'

'বিশেষ কিছু?' রেডিওম্যানের দিকে ফিরল রানা।

'হ্যাঁ। রেঙ্গুন দূতাবাসে রোটর ডেলিভারির কাজটা আপনাকে স্থগিত রাখতে বলা হয়েছে। ফ্যালকন মিশনের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে আপনাকে তার বদলে।'

'কে দিয়েছে এ নির্দেশ?'

'আর কে।'

'আর কে? তিনি কিভাবে নির্দেশ দিলেন?'

ঢাকার সাথে কিভাবে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে তা খুলে জানাল সে ওকে। শেষে বলল, 'অবশ্য আপনার যদি সন্দেহ থাকে, লোটাসের মাধ্যমে কমিউনিকেট করতে পারেন আপনি বিসিআইয়ের সাথে।'

কিছু বলল না রানা—ভাবছে।

'রানা,' হাত ইশারায় ওকে পাশে বসতে বলল ক্যাপ্টেন। 'শুনুন, সময় শেষ হওয়ার আগেই বলে নিই···কাজটা, কাজটা খুব কঠিন হবে মনে হচ্ছে। কাছে পিঠেই ঘুর ঘুর করছে···অসংখ্য···অসংখ্য বর্মী ইন্টেলিজেন্সের চর··· যে কজনকে ধরেছি, ওদের কথা ভেবে খুব ভয় হচ্ছে···এত গোপন প্ল্যানও হয়তো ফাঁস হয়ে গেছে। নইলে···নইলে এই এলাকার আশেপাশেই কেন··· কেন ঘুরঘুর···খুব সতর্ক থাকতে হবে আপনাকে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' ওর হাত ধরে মৃদু চাপ দিল রানা। 'এখন চুপ করুন তো।'

'না!' ধমকে উঠল জাহেদ, 'সময়···সময় শেষ হয়ে আসছে···আমি জানি। এখন না বললে আর···বলা হবে না। আমার···আমার মনে হয়,' গলা নামিয়ে রানার কানে কানে বলল, 'এখানকার এদের মধ্যে··· কোন··· কোন ট্রেইটর আছে। খুব···সাবধান থাকতে হবে··· কিন্তু। প্ল্যানের বাকি অংশ জসিমের···কাছ থেকে জেনে নেবেন। জসিম!'

'ক্যাপ্টেন।'

'রাশেদ কোথায়? আর গোরা···ওদের ডাকুন। রানার মিশনের···চার্জ টেক ওভার···করার ব্যাপারটা···এখনই জানাতে হবে ওদের।'

'জ্বি, স্যার।'

'এই হলো, স্যার অবস্থা,' দু হাতের তালু চিত করে অসহায় একটা ভঙ্গি করলেন ব্রিগেডিয়ার জলিল। 'ওদিকে সব বরবাদ হতে চলেছে, স্যার। এ মুহূর্তে রানা ছাড়া কারও পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমি বললে শুনবে না ও, জানা কথা। এদিক ওদিক হয়ে গেলে ইবরাহিমকে হয়তো চিরতরে হারাতে হবে।'

থামলেন তিনি। একভাবে চেয়ে আছেন রাহাত খানের দিকে। বৃদ্ধ গভীর চিন্তায় মগ্ন। তাঁর সামনে খোলা একটা ফাইল—ওতে আর্মি ইন্টেলিজেন্সের রেসকিউ মিশনের থারাওয়াদ্দি পৌঁছানোর পর থেকে এ পর্যন্ত যতবার লোটাসের সাথে কথা হয়েছে, তার প্রতিবারের প্রতিটি কথোপকথনের পূর্ণ বিবরণ রয়েছে। একেবারে শেষেরটায় আছে মিশন লীডার ক্যাপ্টেন জাহেদের আহত হওয়ার খবর আর রানার ইমিডিয়েট মেডিকেল হেলপ্ পাঠানোর অনুরোধ।

'আপনি যদি রানাকে অর্ডার না করেন, স্যার,' রাহাত খানকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার মুখ খুললেন ব্রিগেডিয়ার। 'তো···'

'এরকম একটা ভুল ঘটল কিভাবে, বলো তো! রানার ব্যাগটা না হয় দেখতে ডাক্তারি ব্যাগের মত ছিল, কিন্তু তাই বলেই একজনকে অন্য জন বলে ধরে নিল কেন তোমার এই··· কি নাম, জাহেদ?'

'ব্যাপার আছে, স্যার। ও ডাক্তারকে সামনাসামনি দেখেনি কখনও। শুধু তার ফিগার উচ্চতা ইত্যাদির বর্ণনা জানত। মুশকিলটা হয়েছে আসলে, স্যার, মাসুদ রানার সাথে এসব দিক থেকে বিস্ময়কর মিল আছে ওই ডাক্তারের। তাছাড়া, ওর হাতে ছিল ওই ব্যাগ। সব মিলিয়ে জগাখিচুড়ি হয়ে গেছে।'

'সিভিল ডাক্তার পাঠালে কেন? সিএমএইচ থেকে কাউকে···'

'সম্ভব ছিল না, স্যার। মাত্র দু ঘণ্টার নোটিসে ওদেরকে পাঠিয়েছি আমি। এরমধ্যে ওদেরকে জড়ো করা, নেচার অভ অ্যাকশন ঠিক করা, আবার ওদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর বিমান, ওদের সাথে কথা বলা, কুলিয়ে উঠতে পারিনি। তাছাড়া সিএমএইচে হার্ট স্পেশালিস্ট তো মাত্র দুজন। সেই তুলনায় রোগী অনেক. তাই আর ও চেষ্টা করিইনি। এই ডাক্তার আমার ছোট ভাইয়ের

বন্ধু। প্রস্তাবটা দেয়ামাত্র রাজি হয়ে গেল সে, তাই…'

'আচ্ছা।'

'এটা একটা ব্লাইন্ড অপারেশন, স্যার। অনেকটা ভাগ্যের ওপরই ছেড়ে দিয়েছি আমি ওদের বলতে গেলে। ওখানে পৌঁছে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে বলেছি।'

'বুঝেছি। ঠিক আছে।' একটা কাগজে খসখস করে কিছু লিখলেন রাহাত খান। তারপর সেটা বাড়িয়ে ধরলেন ব্রিগেডিয়ারের দিকে, 'আমার হয়ে তুমিই রানাকে নির্দেশটা পৌঁছে দাও। বলো, ওকে মিশনের চার্জ নিতে বলেছি আমি। ওদের সাথে যোগাযোগ করে ফোন কোরো আমাকে, কেমন?'

'শিওর, স্যার,' আকর্ণ বিস্তৃত হাসি ফুটল ব্রিগেডিয়ারের মুখে। কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরলেন, পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে কয়েকটা শব্দ লেখা রয়েছে: এমআরনাইন, ইউআর ইনস্ট্রাকটেড টু টেক ওভার দ্য চার্জ অভ অপারেশন চিতা। উইশ ইউ বেস্ট অভ লাক—আর কে।

ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন ব্রিগেডিয়ার। খুশির আতিশয্যে খটাশ্ করে স্যালুট ঠুকলেন মেজর জেনারেলের উদ্দেশে। 'থ্যাঙ্কিউ, স্যার! থ্যাঙ্কিউ!'

হেসে ফেললেন রাহাত খান। 'তাড়াতাড়ি যাও।'

'জ্বি,' ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

সন্ধের একটু আগে বর্মী সমুদ্রসীমায় প্রবেশ করল ওসমানী। চট্টগ্রাম থেকে প্রায় চারশো কুড়ি মাইল দক্ষিণ পুবে রয়েছে সে এখন। ঘণ্টা দুয়েক আগে সঙ্গে আনা রাডার জ্যামিং গিয়ার চালু করে দেয়া হয়েছে। ব্রিটেনের তৈরি এই সিমসন সুপার ১০ই এলএক্স-এর রেঞ্জ প্রায় একশো মাইল। যতক্ষণ চালু থাকবে, কোন রাডারের সাধ্য নেই ওসমানীকে ট্রেস করে।

ফোরডেকে দাঁড়িয়ে আছে মেজর আনোয়ার। পশ্চিম দিগন্তে টকটকে লাল প্রকাণ্ড সূর্যটা ডিউটি শেষ করে বিদেয় নিচ্ছে। দেখতে দেখতে অর্ধেকটা তলিয়ে গেল তার সমুদ্রে। আনমনা হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে সে। চারদিকে দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ, যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি—কি বিশাল, কি ব্যাপক, কত সুন্দর এই পৃথিবী।

বাবা! মনে মনে হেসে উঠল আনোয়ার। বিড় বিড় করে বলল, 'মেজর সাহেব কি কবি হয়ে গেলেন নাকি?'

আকাশে একটা দুটো করে তারা ফুটতে শুরু করেছে। বাতাস তেমন একটা নেই বললেই চলে। সমুদ্র সুবোধ ছেলেটির মত শান্ত। রাজহংসীর মত তরতর করে এগিয়ে চলেছে ওসমানী দ্রুত গতিতে। দুটোর দিকে ঢাকার সর্বশেষ বার্তা রিলে করেছে সে ফ্যালকনকে। মাসুদ রানাকে মিশনের দায়িত্ব নেয়ার নির্দেশ ছিল ওটা। কি যে চলছে ওখানে, বোঝা যাচ্ছে না। কে এই মাসুদ রানা, জানে না মেজর আনোয়ারুল ইসলাম। জানতে চায়ও না, শুধু প্রার্থনা করছে, মিশনটা যেন সফল হয়। তাদের এতদূর ছুটে আসা যেন বিফল না হয়।

সিমসন সুপার-এর কথা মনে পড়তে পুলকিত হয়ে উঠল সে। বর্মী নৌ বাহিনীর সাধ্য নেই ওসমানীর অস্তিত্ব টের পায়। ওদের নাকের ডগার ওপর দিয়ে কাজ সেরে ফিরে যাবে সে দেশে কেউ কিছু টের পাওয়ার আগেই। ভাবতে ভাবতে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল মেজরের, অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ অনুভব করছে সে।

দশ

প্রায় আধঘণ্টা পরিশ্রমের পর মুখ খোলানো গেল একজনের। চারজনকে চারটে গাছের সাথে বেঁধে গায়ের কাপড়-চোপড় সব খুলে নেয়া হলো রাশেদের হুকুমে। এরপর কোমরের ভারী আর্মি বেল্ট দিয়ে বিস্তর মারধর করল সে লোকগুলোকে, সেই সাথে তাদের বাপ-মা তুলে সমানে গালি-গালাজ করল অকথ্য অশ্রাব্য ভাষায়। সারা গায়ে কালসিটে পড়ে গেল লোকগুলোর, ফুলে ফুলে উঠল আঘাত লাগা জায়গাগুলো। চামড়া কেটেও গেল কোথাও কোথাও।

কিন্তু খুব একটা কাজ হলো না তাতে। বারবার একটাই প্রশ্ন করে চলল রাশেদ, তারা কর্নেল মঙের হুকুমে এদিকে এসেছে কি না। হ্যাঁ-না কিছুই বলল না একজনও। পরিশ্রান্ত হয়ে খানিক বিশ্রাম নিতে বসল এবার সে। এই ফাঁকে কোত্থেকে খুঁজে পেতে বেলগাছের কাঁটার মত দেখতে, তবে আরও লম্বা, কিছু কাঁটা নিয়ে এল সোলায়মান।

নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাশেদ। প্রায় বিনা আয়াসেই কাজ হয়ে গেল এবার। প্রথমজনের নখের ভেতর দুটো কাঁটা ঢুকিয়ে দিতেই মুখ খুলল সে। গড়গড় করে অনেক কথাই বলল লোকটা। বেশিরভাগই অর্থহীন, তবে এটুকু জানা গেল, তারা প্রত্যেকে বর্মী আর্মি ইন্টেলিজেন্সের স্থানীয় 'সোর্স'।

সাথে সাথে নতুন লীডার মাসুদ রানাকে জানাল সে ব্যাপারটা। রানা তখন প্ল্যানের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করছিল জাহেদের সাথে। উঠে এল ও। জিনিয়াও এল পিছন পিছন। লোকটাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল ও রাশেদের মধ্যস্থতায়।

'তোমরা ঠিক এইদিকেই কেন, তোমরা কি জানতে ঠিক কোথায় পাওয়া যাবে চিতাকে?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল লোকটা, চুলের ডগায় জমে থাকা কয়েক ফোঁটা ঘাম ছিটকে পড়ল। 'হ্যাঁ।'

'কি করে জানলে?'

'রেঙ্গুন থেকে নির্দেশ এসেছে স্থানীয় বি এ আই চীফের মাধ্যমে।'

'রেঙ্গুন কি করে জানল এখানেই পাওয়া যাবে চিতাকে?'

'জানি না।'

'মঙ কোথায়?'

'জানি না।'

'সে যদি জানে যে এখানেই চিতাকে পাওয়া যাবে, তাহলে সে নিজে না এসে তোমাদের কেন পাঠাল?'

'জানি না।'

'এদিকে আসার নির্দেশ কখন পেয়েছ তোমরা?'

'ভোর চারটের সময়।'

সাথে সাথে ভুরু কুঁচকে গেল রানার। একটু আগেই জাহেদ বলেছে, পৌনে চারটার দিকে এখানে পৌঁছেছে ওরা। লোকটার মুখের দিকে চেয়ে থাকল রানা, মনে হলো সত্যি কথাই বলছে লোকটা। কি মনে হতে ঘড়ি দেখল, সাড়ে পাঁচটা বাজে। লোকগুলোকে সোলায়মান আর রহমানের ওপর ছেড়ে দিয়ে রাশেদকে নিয়ে জাহেদের ঘরের দিকে পা বাড়াল রানা।

'চিতা এখন কত্ত দূরে আছেন বলে মনে হয়?'

'চার পাঁচ মাইল হবে।'

'আমাদের আর তাঁর অবস্থানের মাঝখানে এমন কোন নিরাপদ জায়গা আছে যেখানে অন্তত সন্ধে পর্যন্ত রাখা যায় তাঁকে?'

একটু চিন্তা করে উত্তর দিল রাশেদ। 'আছে। মাঝামাঝি জায়গায় খুব পুরানো একটা বৌদ্ধমন্দির আছে, পোড়ো। কেন?'

'খোলা জায়গায়?'

'না। এদিকে সব জঙ্গল, খোলা জায়গা বলতে গেলে নেই-ই।'

'গুড। তাহলে এক কাজ করুন, আপনি এখনই রওনা হয়ে যান। মেজর জেনারেলকে ঠেকান, তাঁর এখানে আসা ঠিক হবে না। ওনাকে নিয়ে ওই মন্দিরে থাকুন আপনি। আমরা সন্ধের পর পরই আসছি। রহমান, গোরা এদের নিয়ে যান। লোকেশনটা সোলায়মানকে জানিয়ে যান। ও নিয়ে যাবে আমাদের।'

'ঠিক আছে।'

'চিতাকে আবার মিস্ করবেন না তো পথের মাঝখানে?'

'সে সম্ভাবনা নেই। কোন্ পথে উনি আসবেন, আমি তা জানি। তাছাড়া,' পকেট থেকে কি একটা বের করল রাশেদ। 'এটা থাকতে চিন্তার কিছু নেই।'

'কি ওটা?'

'বাঁশি। ফুঁ দিলে কোকিলের ডাক বেরোয়। চিতার সঙ্গে যারা আছে, তাদের সাথেও আছে এই জিনিস,' হাসল রাশেদ। 'এখন কোকিল ডাকার সময় নয়, তাই এই ডাকটাকে বেছে নিয়েছি।'

'এতে লাভ?'

'চিতার বডিগার্ডরা থেমে থেমে এই বাঁশি বাজাতে বাজাতে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে আসছে। পাহাড়ী অঞ্চল বলে অনেক দূর থেকেও শোনা যায় এর আওয়াজ। আমরাও বাজাতে বাজাতে যাব। কাজেই…'

'বুঝেছি,' মনে মনে লোকটার বুদ্ধির তারিফ করল রানা। 'অস্ত্রশস্ত্র কি কি আছে?'

'আটটা স্টেন, দশটা কালাশনিকভ রাইফেল, দুই ডজনের মত হ্যান্ড গ্রেনেড আর পাঁচ ছয়টা পিস্তল-রিভলভার। আর আছে একটা বাজুকা।'

'চমৎকার! গোলাগুলি?'

'মন্দ নয়, আছে।'

'এখানেই আছে সব?'

'না। সবার হাতে হাতে আছে। তবে একটা স্টেন, কিছু গ্রেনেড আর বাজুকাটা এখানেই আছে।'

'ঠিক আছে, বাজুকাটা তুলে ফেলুন ট্রাকে। শুধু স্টেন আর দুটো গ্রেনেড রেখে যান আমাদের জন্যে। জসিমের কাছ থেকে একটা হ্যান্ডসেট নিয়ে যান অয়্যারলেসের। প্রয়োজনে কথা বলতে পারব আমরা।'

'ওকে। কিন্তু এ ব্যাটাদের কি করা যায়? শেষ করে···'

'না। অনর্থক খুনোখুনি পছন্দ করি না আমি। তাছাড়া এরা যা করেছে, পেশার খাতিরেই করেছে। এদের ব্যাপার আমি দেখছি, আপনারা রওনা হয়ে যান।'

'বেশ।'

রাশেদ ওদিকে যাত্রার তোড়জোড়ে ব্যস্ত। এই ফাঁকে গোরাকে ডেকে নিচু গলায় কিছু বলল রানা। বারকয়েক মাথা ঝাঁকাল গরিলা, মুখটা ক্রমেই গম্ভীর, থমথমে হয়ে উঠল। গালের পেশী ফুলে ফুলে উঠছে ঘন ঘন। যখন মুখ খুলল লোকটা, মনে হলো প্রকাণ্ড এক পিপের ভেতর থেকে বেরুচ্ছে কথাগুলো। 'আপনে কোন চিন্তা করবেন না, স্যার। আমি আছি।' মনে হলো কথাগুলো যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে সে। নিজের ভেতরকার বিশ্বাস আর আস্থার ভিত্ আরও দৃঢ় করার জন্যে আবারও বলল, 'আমি আছি।'

'আপনার ওপর বিশ্বাস আছে আমার। চোখ-কান খোলা রাখবেন। সন্ধের পরপরই আসছি আমরা। একসাথে সবার যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

'আচ্ছা।'

ঠিক দশ মিনিট পর রওনা হয়ে গেল দলটা ট্রাক নিয়ে। রানা, জিনিয়া, ক্যাপ্টেন জাহেদ, সোলায়মান আর রেডিওম্যান জসিম রয়ে গেল। এর মধ্যে আরও নিস্তেজ হয়ে পড়েছে জাহেদ। আগের মত সারাক্ষণ গোঙাচ্ছে না যদিও, তবে ঝিম্ মেরে আছে। লক্ষণটা সুবিধের নয়। জিনিয়ার সাহায্যে ওর পুরানো ব্যান্ডেজ খুলে ফেলল রানা সাবধানে। পোড়া ঘায়ের অবস্থা দেখে সভয়ে চোখ বুজল মেয়েটা।

ব্যান্ডেজের সাথে গলা, বুক আর মুখমণ্ডলের কালচে পোড়া চামড়াটুকু উঠে এসেছে। আপনাআপনি গাল কুঁচকে উঠল ওর লোকটার কষ্টের কথা ভেবে। যত্নের সাথে নতুন করে আরেক প্রলেপ মলম লাগিয়ে অবশিষ্ট গজটুকু দিয়ে আবার ব্যান্ডেজ করে দিল ও জাহেদের ক্ষত।

'মিছেই কষ্ট করছ আমাকে নিয়ে, মেজর।' এর মধ্যে 'তুমিতে' নেমে

এসেছে ওদের সম্পর্ক। 'এখন আর কিছুই প্রায় দেখতে পাচ্ছি না চোখে।'

চুপ করে থাকল রানা। এই সেই উদ্ধত, বদরাগী ক্যাপ্টেন জাহেদ, ভাবতেই পারছে না। একেবারে বাচ্চা ছেলের মত অসহায় হয়ে পড়েছে। পাশে বসে অনেকক্ষণ ধরে এটা ওটা নিয়ে আলাপ করল রানা জাহেদের সাথে। মাঝে মধ্যে এক আধটু সান্ত্বনাও দিল। যদিও জানে, এসব ছেলেভোলানো কথায় তেমন কাজ হচ্ছে না।

একসময় হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল সে। 'আমার জন্যে তুমি ভাবছ, এতেই আমি খুশি, রানা। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বলছিলাম, সন্ধে বোধহয় হয়ে এল, আর দেরি না করে রওনা হয়ে গেলে হত না? আটটার ভেতর ইরাবতি পেরুতে পারলে ভোরের আগেই পৌঁছে যাবে ড্যানসন বীচে,' থেমে হাঁপাতে লাগল সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল রানা। 'হ্যাঁ, আর একটু পরই রওনা হব ভাবছি। আচ্ছা, ড্যানসন থেকে বওমি বীচ কতদূরে, জানো?'

'দশ মাইল দক্ষিণে, কেন?'

'না, এমনিই,' আনমনে বলল রানা।

'খুব ভোরে তোমাদের নিতে আসবে ওরা, বুঝলে? মোট ষোলোজন, তিনটে স্পীডবোট নিয়ে আসবে। দূরও তো কম নয়, প্রায় দেড়শো মাইল। তারওপর রাস্তার যা অবস্থা! আমার মনে হয় এখনই রওনা হওয়া উচিত তোমাদের।'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার, 'তার মানে? তোমাদের বলতে তুমি···'

'হ্যাঁ, রানা। আমি তোমাদের সাথে যাচ্ছি না। আমাকে নিয়ে ঝামেলা হবে।'

'কিসের ঝামেলা?'

অসহিষ্ণু হয়ে উঠল জাহেদ। 'আমি সঙ্গে থাকলে বিপদ বাড়বে তোমাদের। চিতা নিজে একজন রোগী, আমিও আরেক বোঝা, একা একা সামাল দিতে পারবে না তুমি।'

'চুপ করো।'

'শোনো, রানা···'

'পরে শুনব,' উঠে দাঁড়াল রানা। 'এখন চুপ করো।'

'ধ্যাত্তেরিকা!' রেগে গেল ক্যাপ্টেন, 'সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করো।'

'বুঝেছি। কিন্তু আমি এখন এ মিশনের লীডার। কি করব না করব, সেটা আমিই স্থির করব।'

চট্ করে রানার একটা হাত চেপে ধরল জাহেদ। 'রানা, আমি জানি আমি বাঁচব না। সারা শরীরে অসহ্য জ্বালাপোড়া, এর মধ্যে টানাহ্যাঁচড়া করে আর কষ্ট দিয়ো না আমাকে। ভেবে দেখো, এ পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই তো হলো না আমাকে দিয়ে, তারওপর শেষ সময়ে···একটা পিস্তল রেখে যাও। যতক্ষণ প্রাণটা আছে···,'

বিস্মিত হয়ে ব্যান্ডেজ মোড়া মুখটার দিকে চেয়ে আছে রানা। একবারে

মিথ্যে বলেনি লোকটা। চিতার অবস্থা কি রকম, কে জানে। তারওপর একে নিয়ে পদে পদে হয়তো অসুবিধেই হবে। কিন্তু তবুও, জেনেশুনে এক আহত, অসহায় মানুষকে এভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে চলে যেতে পারে না রানা কিছুতেই। এ অসম্ভব।

'কই, কিছু বলছ না যে?'

প্রসঙ্গ ঘোরাবার চেষ্টা করল রানা। বলল, 'আমি অন্য একটা ব্যাপার ভাবছি, জাহেদ।'

'কি?'

'তোমার আশঙ্কাটাই বোধহয় সত্যি হতে চলেছে।'

'কিসের?'

'রাশেদের দলে একটা ফুটো সত্যিই আছে মনে হচ্ছে।'

সটান উঠে বসল জাহেদ। 'সত্যি?'

'দেখেশুনে সেরকমই মনে হয়।'

'হুঁম!' বলে খানিক কি যেন ভাবল ক্যাপ্টেন। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'কিন্তু ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়, তাহলে এখনও বসে আছে কেন কর্নেল মঙ? ধরছে না কেন আমাদের? ইচ্ছে করলেই তো আমাদের ধরতে পারে ও?'

'তা পারে। তবে বোধহয় একসঙ্গে সবাইকে ধরবে বলে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে। ওই লোকটার কথায় তাই মনে হলো আমার। চিতাকেও ধরবে, সেই সাথে বিদেশী স্পাই, কল্পনা করতে পারো?'

'কে হতে পারে, কোন ধারণা?'

'নাহ্। এখনও কিছু বুঝতে পারছি না,' ঘড়ি দেখল রানা। প্রায় সোয়া ছটা। চারদিক বেশ আঁধার হয়ে এসেছে। 'চলো,' জাহেদের হাত ধরে টানল রানা, 'এখনই রওনা হব।'

'কিন্তু···রানা···,'

অন্যদিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল রানা। লোকটার দুর্বলতা বুঝে নিয়েছে ও কথায় কথায়। 'তুমি জানতে চাও না, কে বিশ্বাসঘাতক, মঙের চর?'

হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াতে গেল জাহেদ। 'চাই, একশোবার। চলো।'

'দাঁড়াও, একটু অপেক্ষা করো, একটা কাজ সেরে আসি।'

একটা গুণ আছে কর্নেল মঙের, স্বীকার করতেই হবে—তা হলো ধৈর্য। এমন অপরিসীম ধৈর্য লাখে একজনের মধ্যেও আছে কিনা সন্দেহ। গত তেত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রথমবার আধ ঘণ্টার জন্যে, পরেরবার এক ঘণ্টার জন্যে অফিস থেকে বের হয়েছিল সে। প্রথমবার গিয়েছিল হো চি মিন রোডে, একটা বাড়িতে হানা দিতে, দ্বিতীয়বার এয়ারপোর্টে।

তারপর সেই যে অফিসে এসে গ্যাঁট হয়ে বসেছে, আর নড়ার নামটি নেই। খাওয়া নেই, ঘুম তো নেই-ই, অফিস কামরার এক কোণে বড়সড়

একটা ইজিচেয়ার থাকা সত্ত্বেও ওটায় একবার পিঠ পর্যন্ত লাগায়নি সে এই দীর্ঘ সময়ে। এখানে বসেই একের পর এক টেলিফোন করেছে এখানে-ওখানে, গরম করে তুলেছে আবহাওয়া।

প্রেসিডেন্ট সও মঙের কাজিন সূত্রে এমনিতেই দাপট তার কম নয়, তার ওপর নিজেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক পদে অধিষ্ঠিত। দেশের চীফ অভ আর্মি স্টাফ পর্যন্ত হুজুর হুজুর করে তাকে। রাতে রাশেদের জীপ গাড়িতে হোমিং ডিভাইস বপন করার সাথে সাথে মন থেকে সব উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেছে কর্নেলের। এখন সে নিশ্চিত ভাবে জানে, কোথায় রয়েছে ওরা।

.কম্পিউটারের স্ক্রীনে জ্বল জ্বল করছে একটা ফোঁটা, টিপ টিপ করে জ্বলছে, নিভছে সেই সাথে আওয়াজ করছে পিঁক পিঁক, পিঁক পিঁক। সারারাত মুভ করেছে ও া, তারপর থেমে পড়েছে এক জায়গায়। কোথায় আছে ওরা, নিশ্চিত ভাবে ঃ নে কর্নেল। থারাওয়াদ্দিতে, মংড়ু গ্রামে।

তবু, এখনই াওয়া করতে রাজি নয় সে। আরও একটু অপেক্ষা করতে চায়। কারণ তার ভয় পাওয়ার, বা চিন্তার কিছু নেই। কর্নেল জানে, চিতা কোনমতেই পালাতে পারবে না। বাংলাদেশের সাথে বর্মার প্রতি ইঞ্চি সীমান্ত এমনভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে যার ফাঁক গলে একটা পিঁপড়েও পেরুতে পারবে না। এছাড়া, সারা আরাকান রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তার কয়েকশো চর—প্রত্যেকে ট্রেইনড।

মেজর জেনারেল ইবরাহিম থেকে শুরু করে লেফটেন্যান্ট রাশেদ, আবদুর রহমান, সোলায়মানসহ ইদানীং যে সব মুসলমান আর্মি থেকে ভেগেছে, তাদের প্রত্যেকের একটা করে বি-টু সাইজ ছবি আছে সবার পকেটে। ওদের সাথে আছে পুলিস ও অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার প্রচুর সদস্য, সব কাজ ফেলে এদের পিছনে লেগে আছে। তিন-চারজনের ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে কাজ করছে। রাশেদের গাড়ি কোথায় আছে, পরিষ্কার জানা আছে তাদের। প্রায় প্রতিটি গ্রুপ লীডারের হাতে ধরা ডিরেকশন ফাইন্ডার, ডিভাইসটা সারাক্ষণ তারস্বরে চেঁচিয়ে জানান দিচ্ছে, আমি এখানে! আমি এখানে!

ইচ্ছে করলে অনেক আগেই ধরতে পারত তারা দলটাকে। কিন্তু কর্নেল মঙের নির্দেশ, দূরে থাকো। শুধু নজর রাখো চিতা কখন ওই দলের সাথে যোগ দেয়, তারপর আমাকে জানাও। যা করার আমি করব। নিজে অ্যারেস্ট করতে চাই আমি হারামজাদাকে।

রানার ধারণাই নেই, সারাদিনই ওদের ওপর দূর থেকে নজর রেখেছে দশ বারোজন ওয়াচার। এখনও আছে তারা, পাহাড়ে জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে। ট্রাক নিয়ে রাশেদ আড়াল ছেড়ে বেরুনো মাত্র খবর পেয়ে গেছে কর্নেল মঙ।

'ট্রাক?' কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল মঙ। 'ট্রাক এল কোত্থেকে আবার?'

'জানি না, কর্নেল। তবে আগে দেখিনি ওটাকে।'

'কে কে আছে ওতে?'

'লেফটেন্যান্ট রাশেদ, রহমান, কায়েস, সবুর আর হানিফ। আর এক

লোক···দাড়িওয়ালা। ছাপা শার্ট গায়ে, ইয়া মোটা, গরিলার মত লাগছে।'

'বুঝেছি। ও এসেছে বাংলাদেশ থেকে। উইনের বর্ণনার সাথে মিলে যাচ্ছে। ওরা কেউ নেই, ইবরাহিম বা ওর মেয়ে?'

'না, স্যার।'

'সাথে অস্ত্রশস্ত্র কিরকম আছে?'

'তেমন কিছু দেখছি না, কর্নেল। গোটা দুয়েক স্টেন, দুটো কালাশনিকভ ···এই আর কি!'

'ঠিক আছে। লক্ষ রাখো।'

প্রচুর মাছ ধরল জননী। আরেক দেশের জলসীমায় ঢুকে সারাদিন ধরে মাছ চুরির অভিজ্ঞতা এই প্রথম অর্জন করল লেফটেন্যান্ট কামাল। এফ. বি. জননীর নেতৃত্বে রয়েছে সে। ক্রু-র ছদ্মবেশে ছ জন কমান্ডো আছে তার সঙ্গে, এছাড়া আসল ক্রু-রা তো আছেই। বিশেষ একটা উদ্দেশ্য আছে কামালের। মেজর আনোয়ারের নির্দেশ, যত পারো মাছ ধরো। বর্মী কোস্ট গার্ড যদি ধাওয়া করে, সোজা লম্বা দেবে। অবশ্য ওরা ধাওয়া বন্ধ করে ফিরে যাওয়ামাত্র আবার আসতে হবে জননীকে, যদি সম্ভব হয়। ঘুর ঘুর করতে হবে তাকে আকিয়াবের কাছাকাছি। তাই করছে ওরা সারাদিন ধরে।

জননীর বৃদ্ধ ক্যাপ্টেনও মজা পেয়ে গেছে। বেশ জমিয়ে নিয়েছে সে লেফটেন্যান্টের সাথে কথায় কথায় একবার বলেছে, একদিনে এত মাছ ধরেনি সে তার চল্লিশ বছরের চাকরি জীবনে। তার ধারণা কামাল খুব ভাগ্যবান মানুষ। ওর জন্যেই নাকি সম্ভব হয়েছে এটা। ও নিজেও অবশ্য ব্যাপারটা উপভোগ করছে খুব। এতদিন এক দেশের ফিশিং ট্রলারের অন্য দেশের সমুদ্রসীমায় গিয়ে মাছ চুরির ঘটনা কেবল শুনেই এসেছে সে। আজ বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো।

বিকেলের দিকে তাড়া করা হলো জননীকে। দূর থেকে বর্মী নৌ বাহিনীর একটা ভট্‌ভটিয়া মার্কা মান্ধাতা আমলের গানবোটকে ছুটে আসতে দেখে পালাল জননী ভরপেট মাছ নিয়ে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আবার ফিরে এল সে, কিন্তু টিকতে পারল না। প্রায় সাথে সাথে আবার ধাওয়া করা হলো।

কিন্তু জননীর গতির সাথে এঁটে উঠতে পারল না গানবোট। কাজেই জননী আন্তর্জাতিক জলসীমায় নাক ঢোকানোমাত্র ফিরে আসতে হলো তাকে। এমনি করে আরও দু তিনবার চলল চোর-পুলিস চোর-পুলিস খেলা। শেষে হয়রান হয়ে পড়ল ভট্‌ভটিয়া। অয়্যারলেসে রিপোর্ট করল আকিয়াবের নৌ-ঘাঁটি কর্তৃপক্ষকে, সাহায্য চেয়ে পাঠাল।

দুইয়ে দুইয়ে চার হলো। অতএব বিন্দুমাত্র দেরি না করে যোগফলটা কর্নেল মঙকে জানিয়ে দিল কর্তৃপক্ষ। উত্তর এল, ধাওয়া করার দরকার নেই, থাকুক ওটা ওখানেই। শুধু নজর রাখা হোক।

আঙিনায় বেরিয়ে এসে পিছন ফিরে জিনিয়াকে ডাকার জন্যে মুখ খুলতে

যাচ্ছিল রানা, কিন্তু জমে গেল আচমকা, খাঁচার গায়ে দড়াম করে বাড়ি খেল হৃৎপিণ্ড। ওটার ধুপ ধাপ্ ধুপ্ ধাপ্ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে রানা। জাহেদ আর জিনিয়া যে ঘরে আছে, তার পিছনে, অনেক দূরে একসার পাহাড়। ওই পাহাড়ের ওপরই কোথাও একটা আলো ঝিলিক মেরে উঠেছে এইমাত্র, পলকের জন্যে, পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে রানা। ঠিক যেন কাঁচের গায়ে সূর্যের প্রতিফলন।

ঘাড় ঘুরিয়ে ওদিকে আবার তাকাতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু সামলে নিল শেষ সময়ে। ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছে অন্যদিকে। কিসের আলো ওটা? নজর রাখা হচ্ছে ওদের ওপর? বিনকিউলারে চোখ রেখে···। এবার আর সন্দেহ নয়। স্থির নিশ্চিত হলো ও, নিশ্চয় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কেউ এদের মধ্যে। নাকি অন্য কোনভাবে···।

এভাবে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবে ঘুরে দাঁড়াল রানা, একটু জোর পায়ে ফিরে চলল ঘরটার দিকে, এমন ভাব করল যেন কিছু ফেলে এসেছে। কয়েক পা এগিয়ে যখন বুঝল আড়ালে চলে এসেছে, দাঁড়িয়ে পড়ল আবার। চোখ তুলে চাইল রানা, ঘরের চালার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেছে পাহাড় সারি।

খোলা দরজা দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ জিনিয়া, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কি?'

'না, কিছু না।'

ভেতরে ঢুকে পিছনের দেয়ালের কাছে এসে দাঁড়াল রানা। ওপরদিকে বড় একটা ফুটো দেখে চোখ রাখল তাতে। দেখে মনে হয় যেন কাছেই, কিন্তু আসলে অনেক দূরে রয়েছে পাহাড়গুলো—কম করেও চার পাঁচ মাইল পুবে। সূর্য অনেকটা পশ্চিমদিকে হেলে পড়েছে বলেই দেখা গেছে ঝলকটা, নইলে হয়তো অজানাই থেকে যেত নজর রাখার ব্যাপারটা।

ওর পিছনে এসে দাঁড়াল জিনিয়া। প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, রানা?'

বহুকষ্টে একটু হাসল রানা। একে এ ব্যাপারে এখনই কিছু বলা ঠিক হবে না। ভয় পেয়ে যেতে পারে। বলল, 'তেমন কিছু না, ধাঁধা।'

'ধাঁধা?'

'মানে, একটা ধাঁধা-র উত্তর খুঁজছি। পরে জানাব।'

আর কিছু বলল না জিনিয়া। কিন্তু সন্দেহের মেঘ দূর হলো না চেহারা থেকে।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। এই সময় জাহেদ বলল, 'রানা, খারাপ কিছু ঘটেছে?'

ভাগ্যিস বাংলা বোঝে না জিনিয়া। 'একটু পরে বলছি তোমাকে,' মুখটা তেমনি হাসিহাসি রেখেছে রানা। মেয়েটাকে বোঝাতে চাইছে, সত্যিই মন্দ কিছু ঘটেনি। 'তোমার ক্যাপটা কোথায়, জাহেদ?'

কখন কোন্ আচরণ করতে হবে, জানা আছে ক্যাপ্টেনের। কিছু একটা অনুমান করলেও কোন প্রশ্ন করল না। 'বোধহয় ফার্মহাউসে রেখে এসেছি,

জসিমের টেবিলের ওপর।'

'ঠিক আছে। আর শোনো, যদি দেখো, বা বোঝো যে আমি কোন অস্বাভাবিক আচরণ করছি, চেপে যেয়ো। কোন প্রশ্ন কোরো না।'

'ঘাপলা?'

'হ্যাঁ,' জিনিয়ার দিকে ফিরল রানা। 'এখানেই থাকুন। আমি আসছি।'

বেরিয়ে গেল রানা। প্রায় সাথে সাথে ফিরে এল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ডাকল জিনিয়াকে, 'আসুন আমার সঙ্গে। ও ব্যাটাদের ব্যবস্থা করে আসি।'

ওর সামনে এসে দাঁড়াল জিনিয়া। চোখে চোখে চেয়ে থাকল নিষ্পলক। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, 'ধাঁধাটা কিসের, রানা? বলবেন না আমাকে?'

বাঁ হাত বাড়িয়ে জিনিয়ার ক্ষীণ কটি জড়িয়ে ধরল মাসুদ রানা, আলতো করে আকর্ষণ করল ওকে নিজের দিকে। 'উত্তরটা পেলে তো!'

জিনিয়ার চাউনি বলছে, ও ধরে ফেলেছে যে রানা কিছু একটা গোপন করে যাচ্ছে। যত সরল ভেবেছে ওকে রানা, ততটা আসলে নয় সে। কিছু একটা ঘটেছে, ঠিকই টের পেয়ে গেছে।

'আমি কথা দিচ্ছি, পরে জানাব,' বলল রানা। 'এখন যা বলি, বিনা প্রশ্নে তাই করুন। অলরাইট?'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল জিনিয়া। 'ঠিক আছে।'

'গুড। এবার চুলগুলো মাথার ওপর তুলে এই ক্যাপটা পরে নিন।'

'কেন?'

'ফের?'

'বেশ।'

কাজটা শেষ হতে জিনিয়াকে ঘুরে-ফিরে দেখল রানা। মনে মনে সন্তুষ্ট হলো। 'হ্যাঁ, চলবে।' পকেট থেকে রুমাল বের করে ওর ঠোঁটের হালকা লিপস্টিক মুছে দিল। 'মনে থাকে যেন, এ নিয়ে কারও সামনে একটা কথাও উচ্চারণ করা চলবে না।'

'ঠিক আছে।'

মোটামুটি আশ্বস্ত হলো রানা। অত দূর থেকে আশা করা যায় বোঝা যাবে না এ মেয়ে কি ছেলে। ও নিশ্চিত নয়, এরই মধ্যে ওকে দেখে ফেলেছে কি না। তাই জিজ্ঞেস করল, 'শেষবার কখন বেরিয়েছিলেন ঘর থেকে?'

'ঘণ্টাখানেক আগে হবে বোধহয়।'

'বেরিয়ে কোন্‌দিকে গিয়েছিলেন, ফার্মহাউসের দিকে?'

'না। ওদিকে,' হাত তুলে জঙ্গলের দিকটা দেখাল জিনিয়া। 'ওদেরকে ইন্টারোগেট করা হচ্ছিল, তাই দেখতে গিয়েছিলাম।'

আশপাশে তাকাল রানা, যে রকম বন-জঙ্গল তাতে ওখান থেকে শুধু খোলা আঙিনাটা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় বলে মনে হলো না। এছাড়া জীপ আর পাহাড়ের মাঝে বেশ উঁচু একটা ঘন ঝোপ থাকায় ওটাকেও নিশ্চয়ই দেখা যাচ্ছে না।

'ঠিক আছে, চলুন।'

পায়ে পায়ে গাড়িটার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। চোখ কুঁচকে চেয়ে থাকল রানা ওটার দিকে। ধীর পায়ে চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে এল।

'কিছু খুঁজছেন?'

পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'হোমিং ডিভাইস চেনেন?'

'কি?'

'হোমিং ডিভাইস,' তিন আঙুল দিয়ে ছোট্ট একটা আকৃতি করে দেখাল ও মেয়েটাকে। 'ম্যাগনেট লাগানো আছে। ইচ্ছে করলে গাড়ির স্টীল বডির সাথে আটকে দেয়া যায়।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল জিনিয়ার। 'ওটা কি কোন সিগন্যাল দেয়?'

'দেয়।'

'ভাবছেন···ভাবছেন, এটায় সে ধরনের কিছু আছে?' মুখ শুকিয়ে গেছে ওর।

'ভাবাভাবির দরকার কি? আসুন, দুজনে মিলে চেক করে দেখি। আপনি পিছন দিকটা,' ইশারায় ওকে নিচে ঢুকতে বলল রানা। নিজে চলে এল সামনের দিকে। উবু হয়ে বসে প্রথমে দুই মাডগার্ডের নিচে নজর বোলাল ভাল করে। তারপর চিত হয়ে ঢুকে পড়ল ল্যান্ড রোভারের তলায়।

'রানা!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জিনিয়া।

আওয়াজটা কানে যাওয়ামাত্র মনে হলো কেউ যেন মুঠো করে চেপে ধরেছে ওর হৃৎপিণ্ড। কয়েক সেকেন্ড স্থবির হয়ে থাকল রানা। সংবিৎ ফিরতে এক ঝটকায় বেরিয়ে এল, প্রায় উড়ে চলে এল জিনিয়ার পাশে। বাঁ দিকের চাকার পাশে উবু হয়ে বসে আছে সে, চেয়ে আছে মাডগার্ডের ভেতরদিকে। দু চোখ বিস্ফারিত। আঙুল তুলে জিনিসটা দেখাল সে রানাকে। কথা বেরুচ্ছে না মুখ দিয়ে, হাত কাঁপছে থর থর করে। ওটার দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল জিনিয়া, কিন্তু চেপে ধরল ও হাতটা।

'ডোন্ট টাচ্!'

সামনে ঝুঁকে আরেকটু ভাল করে নজর বোলাল রানা জিনিসটার ওপর। চৌকোনা একটা মেটাল বক্স। ম্যাচ বাক্সের চেয়েও ছোট। রাশান। হাত ধরে মেয়েটাকে পিছিয়ে আনল ও। দু কান ভোঁ ভোঁ করছে, দ্রুততর হচ্ছে হার্টবিট ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে। তার মানে কি, রেঙ্গুনেই সারা হয়েছে এ কাজটা? নাকি এখানে?

'কি হবে এখন?' প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলল জিনিয়া।

'দাঁড়ান, অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

'আমরা কোথায় আছি, জানে ওরা, তাই না?'

শুনেও না শোনার ভান করল রানা, উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়তে লাগল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানকার পাট চুকিয়ে ফেলার তাগিদ অনুভব করছে। কয়েকটা সম্ভাবনা নিয়ে খানিকক্ষণ মাথা ঘামাল ও, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারল না। ওটা যেখানে আছে, সেখানেই থাকুক আপাতত, ভাবল রানা। কোথায় আছে ওরা, জানার পরও যখন এখনও পর্যন্ত কোন

অ্যাকশন নেয়া হয়নি, দূর থেকে কেবল ওয়াচ রাখা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আশা করা যায় আরও কিছু সময় পাওয়া যাবে।

হঠাৎ খেয়াল হলো, রাশেদের ট্রাকেও কি কোন ডিভাইস ছিল? সর্বনাশ! তা যদি হয়, তাহলে তো বিপদ বরং বাড়ল আরও। নাহ্, দেরি করা যাবে না, এখনই রওনা হতে হবে।

'উঠুন, জলদি!'

দ্রুত জাহেদের ঘরে এসে ঢুকল রানা। বসে বসে ঝিমুচ্ছিল ক্যাপ্টেন, পায়ের শব্দে উঠে বসল। 'রানা?'

'হ্যাঁ। তোমার সাথে জরুরী একটা আলাপ আছে।'

'বলো।'

'কাল তোমরা পথে কোথাও থেমেছিলে এখানে আসার পথে?'

'নাহ্। কেন?'

'কোথাও দাঁড়াওনি?'

'না, ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। থেমেছিলাম। হাইওয়েতে একটা পুলিস পেট্রল থামিয়েছিল আমাদের।'

'পুলিস?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'রাশেদ বলল, ওদের কাছে নাকি গোপন ইনফরমেশন ছিল, কি এক চোরাইমাল বেরিয়ে যাওয়ার কথা রেঙ্গুন থেকে, ওই জন্যে সব গাড়ি থামিয়ে চেক করছিল ওরা রাস্তায়।'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। জিনিয়া এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে। 'তোমাদের গাড়ি চেক করেছে ওরা?'

'না। আর্মি অফিসার দেখে সে সাহস পায়নি।'

'কজন ছিল ওরা?'

'চারজন।'

'এমনি গাড়ির বাইরে গিয়ে ঘুরে দেখেনি ওদের কেউ, বা টর্চ দিয়ে দেখার চেষ্টা করেনি ভেতরে কি আছে না আছে?'

'মনে হয় না। তাছাড়া অতটা খেয়াল করার সুযোগও ছিল না। জাহেদের কথামত আমি আর জসিম তখন ঘুমের ভান করছিলাম। কিন্তু কেন, রানা? কি হয়েছে?'

'তোমাদের গাড়িতে হোমিং ডিভাইস লাগিয়ে দিয়েছিল কেউ। এই জন্যেই আশেপাশে ঘুর ঘুর করছে ব্যাটারা। তাছাড়া এই ঘরের পিছনদিকের পাহাড় থেকে নজর রাখা হচ্ছে আমাদের ওপর দূরবীন দিয়ে, আমি দেখেছি।'

হাঁ করে রানার মুখের দিকে চেয়ে থাকল জাহেদ। বাক্‌শক্তি ফিরে পেতে বলল, 'হায় খোদা! এখন কি হবে তাহলে?'

হাতঘড়ি দেখল রানা। সূর্য ডুবতে এখনও দশ-পনেরো মিনিট দেরি। এখনই রওনা হওয়া দরকার। 'যা হওয়ার হয়ে গেছে,' বলল ও। 'এখন থেকে

আরও সতর্ক হতে হবে। চলো, ওঠো। তৈরি হও, আমি এই ফাঁকে ও ব্যাটাদের বাঁধনগুলো একবার চেক করে আসি।'

কম্পিউটার নিজের রূমে আনিয়ে নিয়েছে কর্নেল মঙ। ঢুলুঢুলু চোখে চেয়ে আছে ওটার স্ক্রীনের দিকে। হঠাৎ শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তার, মাথা ঝাড়া দিয়ে চোখ পিট্ পিট্ করল কয়েকবার। নাহ্, ঠিকই আছে, ভুল দেখেনি। জায়গা বদল করতে শুরু করেছে স্ক্রীনের সেই ফোঁটা।

চট্ করে ঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিল কর্নেল, প্রায় ছটা বাজে। চোদ্দ ঘন্টারও বেশি সময় পরে মুভ করতে শুরু করেছে ল্যান্ড রোভার—টিট্‌কিরির ভঙ্গিতে মুখ বাঁকিয়ে হাসল জলহস্তী, মেজর থান্টের জীপ। প্রচণ্ড উত্তেজনায় ঢিপ্ ঢিপ্ করছে বুকের ভেতরটা, গরম হয়ে উঠেছে দু কান। এগোও, শালা, মনে মনে বলল সে, এগুতে থাকো। আসছি আমি।

ঘুরে টেবিলের ওপর রাখা ছোট্ট সোনালী বুদ্ধ মূর্তিটার দিকে তাকাল। একজনের দেয়া উপহার ওটা, পেপার ওয়েট হিসেবে ব্যবহার করে সে। ধ্যানমগ্ন সৌম্য মুখটার দিকে চেয়ে থাকল সে একভাবে। মহামতি বুদ্ধের আশীর্বাদে ভালই এগিয়েছে সব এ পর্যন্ত, বাকিটুকুও নিশ্চয়ই সম্পন্ন হবে। হঠাৎ করজোড়ে কপাল ঠেকাল কর্নেল বুদ্ধের পায়ের কাছে।

'হে ভগবান···' এর পরেরটুকু বোঝা গেল না, শেষে বলল, '···ওকে ছিঁড়ে খাব আমি!' চোখমুখের চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তার দেখতে দেখতে। গৌতম বুদ্ধের সাথে কথা বলছে সে, অথচ তাঁর অহিংসার বাণী ভুলে বসে আছে বেমালুম।

সিধে হয়ে স্ক্রীনের দিকে তাকাল আবার। এখনও চলছে ফোঁটা। এক ঘন্টা চলার পর থেমে দাঁড়াল। মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে আছে কর্নেল। ঠিক বিশ মিনিটের মাথায় আবার চলতে শুরু করল ওটা। তার মানে, অনুমান করল মঙ, ওখান থেকে এইমাত্র পিক্ আপ করা হলো ইবরাহিমকে। রীতিমত কাঁপতে শুরু করল সে এবার। ঝট্ করে টেলিফোনের রিসিভার তুলেই নম্বর ঘোরাতে শুরু করল। 'মেজর, কপ্টার রেডি?'

'ইয়েস, কর্নেল।'

'কমান্ডো গ্রুপ?'

'এয়ারবেসেই আছে ওরা, আপনার নির্দেশের অপেক্ষায়, স্যার।'

'আমি আসছি।'

'এখনই, স্যার? এই রাতে···'

'থারাওয়াদ্দি যাব। বাকি কাজ ওখানে বসে সারব।'

'ওকে, কর্নেল। আমি এদিকের ব্যবস্থা করে রাখছি।'

রিসিভার রেখে ইন্টারকমের সুইচ টিপল কর্নেল। পাশের কামরা থেকে সাড়া দিল তার পি এস।

'মিন্ট?'

'কর্নেল।'

'আকিয়াবে ফোন করো। বেস কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করো, বাংলাদেশী ট্রলারটা এখনও আছে কি না আমাদের টেরিটোরিতে। তারপর আমার রুমে এসো, কাজ আছে।'

'জ্বি, স্যার।'

এগারো

সোলায়মান বসেছে স্টিয়ারিঙে। মাঝখানে জিনিয়াকে তুলে দিয়ে রানা বসল এপাশে। পিছনের লম্বালম্বি দুটো সীটের একটায় শুইয়ে দেয়া হয়েছে ক্যাপ্টেন জাহেদকে। জসিম বসেছে তার উল্টোদিকে। উঁচু নিচু পাহাড়ী পথ ধরে ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটছে ল্যান্ড রোভার।

ওদের চারজনকে হাত-পা মুখ বেঁধে বনের মধ্যেই ফেলে রেখে এসেছে রানা। খুঁজতে খুঁজতে একসময় সঙ্গীরা ঠিকই বের করে ফেলবে ব্যাটাদের, সে ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত ও। খিদে তৃষ্ণায় খানিকটা কাহিল হয়ে পড়লেও অন্তত প্রাণে মরবে না ওরা কেউ।

পাশে স্তূপ করে রাখা ওদের খুলে নেয়া কাপড়-চোপড়ের ভেতর থেকে বেরিয়েছে একটা 'ব্লিপ ফাইন্ডার'। ভুল করেছিল জাহেদ, প্রথমেই যদি ওদের সার্চ করা হত, তখনই ফাঁস হয়ে যেত ব্যাপারটা। তবে এ ব্যাপারে জাহেদকে আর কিছু বলেনি রানা। এমনিতেই প্রচণ্ড দৈহিক আর মানসিক যন্ত্রণায় আছে লোকটা।

ভেতরে ভেতরে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে জিনিয়া, বুঝতে পারছে রানা। অনেকদিন পর বাবার সাথে দেখা হতে যাচ্ছে, কাজেই ওটা স্বাভাবিক। খানিকটা প্রগলভ হয়ে উঠেছে। তার সব কথা মন দিয়ে শুনছে না ও, মাঝে মধ্যে 'হুঁ' 'হ্যাঁ' করছে। তাতে আরও উৎসাহিত হচ্ছে মেয়েটা, অনর্গল বকে চলেছে।

'জীপের লাফ-ঝাঁপের সাথে জাহেদের গোঙানিও ক্রমশ বাড়ছে। শুয়ে থাকতে পারছে না সে। অথচ আস্তে চালালেও অবস্থার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। তাও মন্দের ভাল, ভাবল রানা, ভাগ্যিস বাংলাদেশের মত খাল-বিলের দেশ নয় বর্মা। তাহলে আর দেখতে হত না। গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে আছে চারদিক। ওদের ডানদিকে একসার পাহাড়। শেয়াল আর ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকে মুখর হয়ে আছে জায়গাটা।

পাঁচ মাইল রাস্তা পেরোতেই প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগল। দূর থেকে গাছপালার ফাঁক দিয়ে ধ্বংস প্রায় কালচে একটা ইমারত চোখে পড়তে সবাই বুঝল, ওটাই সেই বৌদ্ধমন্দির। সাথে সাথে রানার নির্দেশে হেডলাইট অফ করে দিল সোলায়মান। পকেট থেকে দু নম্বর হ্যান্ড সেটটা বের করে গাড়ি থেকে নেমে এল রানা। প্রায় সাথে সাথে সাড়া দিল রাশেদ। সবকিছু ঠিকঠাক

আছে, জানাল সে, এইমাত্র পৌঁছেছেন চিতা।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল রানার। ওর মুখ দেখে যা বোঝার বুঝে নিল জিনিয়া। 'সাবধান, যা বলেছি, মনে থাকে যেন। কাউকে কিছু বলবেন না,' মেয়েটাকে বলল ও।

'মনে আছে,' বলে একছুটে মিলিয়ে গেল সে অন্ধকারের মধ্যে। এবার নিশ্চিন্ত মনে এগোল ল্যান্ড রোভার। মন্দিরের ভেতরে দুটো প্যারাফিন বাতি জ্বলছে টিমটিম করে। ওদের দেখে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রাশেদ।

সহাস্যে বলল, 'আসুন।'

'মেজর জেনারেলের শরীর কেমন?'

'মেয়েকে কাছে পেয়ে সব সেরে গেছে। চলুন, দেখবেন।'

ভেতরে ঢুকল রানা। ঘরের মাঝখানে বাপের বুকে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আছে জিনিয়া। রানার চেয়ে দু ইঞ্চি মত খাটো হবেন হয়তো ভদ্রলোক। মেয়ের মাথায় গাল রেখে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছেন। মোটাসোটা গড়ন, মুখটা প্রায় গোল। হাসিখুশি মুখটা দেখে রানার মনেই হলো না জীবন-মরণ সমস্যা চলছে এঁর। পাশেই দাঁড়িয়ে গোরা আর আবদুর রহমান।

রাশেদ পরিচয় করিয়ে দিতে ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন মেজর জেনারেল, 'আমার জন্যে এত কষ্ট করেছ তোমরা, সেজন্যে তোমাদের ধন্যবাদ। পাঁচ মিনিটেই সব কাহিনী শোনা হয়ে গেছে আমার রাশেদের মুখে। কেমন আছে এখন ক্যাপ্টেন ছেলেটা?'

'মোটামুটি ভাল,' হাতটা ঝাঁকিয়ে দিল রানা। 'আপনার প্রেশার···'

'ও কিছু না, ও কিছু না,' হাসলেন ইবরাহিম। 'এটাকে কাছে পেয়ে সব সেরে গেছে,' মেয়ের পিঠ চাপড়ে দিলেন পরম স্নেহে।

'আমার মনে হয়, এখানে সময় নষ্ট করাটা ঠিক হবে না,' রানা বলল। 'যত তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া যায়, ততই ভাল।'

'হ্যাঁ, চলো যাই,' রাশেদের দিকে তাকালেন চিতা। 'ওদের ডাকো। বিদেয় নিয়ে নিই।'

'ইয়েস, স্যার,' বেরিয়ে গেল রাশেদ মন্দির থেকে।

রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বহু কষ্ট করে এত পথ নিয়ে এসেছে ছেলেরা আমাকে। ওদেরকে অন্তত কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত আমার।'

'শিওর, বাট, উই মাস্ট মুভ ফাস্ট, স্যার,' বলে বেরিয়ে এল রানা। দোরগোড়ায় রাশেদের সাথে দেখা হলো, পিছনে সাত আটজন নিয়ে ফিরে এসেছে সে। গাড়ির কাছে এসে উঁকি দিয়ে জাহেদের দিকে তাকাল রানা। চুপ করে বসে আছে লোকটা। মাঝেমধ্যে এক আধটা কথা বলছে জসিমের সাথে।

'একটু অপেক্ষা করো, এখুনি রওনা হব আমরা,' বলল রানা।

'চিতা পৌঁছে গেছেন?'

'হ্যাঁ।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল ক্যাপ্টেন। ব্যাপারটা দেখেও না দেখার ভান করল রানা। জসিমের দিকে ফিরে বলল, 'রাকস্যাকটা নিয়ে বাইরে আসুন।'

ঝট্ করে এদিকে ফিরল জাহেদ। 'কেন, রানা?'

'পরে শুনো,' পিছন ফিরে হাঁটা ধরল ও।

পিছন পিছন এল জসিম। মন্দির থেকে বেশ খানিকটা সরে এসে থামল রানা। ঘুরে দাঁড়াল, 'লোটাসের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।'

'শিওর,' রাকস্যাকটা মাটিতে নামিয়ে রাখল রেডিওম্যান। 'কি বলতে হবে?'

'ইমার্জেন্সি ফ্রিকোয়েন্সিতে কথা বলুন।'

'কি মেসেজ দিতে হবে, স্যার?'

'বলবেন, ড্যানসন নয়, বওমি বীচ থেকে উঠব আমরা। একটু দূর হয়ে যাবে অবশ্য, কিন্তু নিরাপত্তার খাতিরে এর দরকার আছে।'

'রাইট, স্যার।'

'কেন, ট্রাকে কেন?' ভুরু কোঁচকাল লেফটেন্যান্ট রাশেদ।

'কারণ আছে,' বলল রানা। 'সব কথা বলা যাবে না এখন। হাতে সময় নেই।'

'কিন্তু ট্রাকে তো বসতেই পারবেন না উনি। এত ঝাঁকি···'

'রাশেদ, বলছি এখন কথা বলে নষ্ট করার মত সময় একেবারেই নেই। উই মাস্ট মুভ। অ্যাটওয়ানস।'

'না না, এ হয় না। আপনারা ট্রাকে উঠুন। আমরা জীপে করেই নিয়ে যাব ওনাকে,' জেদের সুরে বলল রাশেদ।

'আমি যা বলছি, তাই হবে,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'আমি মিশন লীডার, আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।'

খেপে গেল রাশেদও। 'হতে পারেন। কিন্তু চিতা এখনও এ দেশে আছেন, আমরাও আছি তাঁর সাথে। তাঁর ভালমন্দের প্রশ্নে আমাদের মতামতের কোন দাম নেই? এরকম অসুস্থ মানুষটাকে এত পথ ট্রাকে করে নিয়ে যেতে চাইছেন আপনি, এটা কোন কথা হলো?'

'সোজা কথাটা কেন বুঝছেন না, আমি যা করছি, চিতার নিরাপত্তার কথা ভেবেই করছি।'

ভেতরের পরিবেশ পাল্টে গেছে। সবাই বুঝতে পারছে কোথাও কোনও গণ্ডগোল বেধে গেছে দু দলের দুই লীডারের মধ্যে। এক কোণে দাঁড়িয়ে চাপা কণ্ঠে বাক্‌বিতণ্ডা চলছে তাদের। মেজর জেনারেল ইবরাহিমও টের পেয়ে গেছেন ব্যাপারটা। পায়ে পায়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

'হোয়াট্‌স্ রঙ, মেজর?' আলতো করে রানার কাঁধে হাত রাখলেন তিনি।

সমস্যাটা তাঁকে জানাল ও। অবশ্য হোমিং ডিভাইসটার প্রসঙ্গে বলল না

কিছুই। 'আমি যা করতে চাইছি, এর কোন বিকল্প নেই, স্যার। তাছাড়া, এ নিয়ে অযথা নষ্ট করার মত সময়ও নেই। আমাদেরকে এক্ষুণি বেরুতে হবে। যে কোন মুহূর্তে মারাত্মক কিছু একটা ঘটে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছি আমি।'

'ওকে, দেন,' ঘুরে রাশেদের মুখোমুখি হলেন মেজর জেনারেল। 'এ নিয়ে আর কথা বাড়ানোর সময় নেই, লেফটেন্যান্ট। ইউ হ্যাভ টু এগ্রী উইথ রানা।'

'কিন্তু ঝাঁকিতে আপনার ক্ষতি হতে পারে, স্যার,' গলায় আগের তেজ আর নেই রাশেদের।

'হবে না,' মিষ্টি করে হাসলেন চিতা। 'চারপাশে তোমরা আমার এত শুভাকাঙ্ক্ষী থাকতে কিচ্ছু হবে না আমার, দেখো। এ এসেছে আমার আরেক বন্ধুর পক্ষ থেকে, যদিও অনেক সিনিয়র তিনি আমার, তাঁকে আমি জানি, রাশেদ। ও আমার ভাল ছাড়া খারাপ চাইবে না।'

একটু চুপ করে থাকল রাশেদ। তারপর ইংরেজীতেই বলল, 'কিন্তু আমার একটা প্ল্যান আছে, স্যার। এটা মানতে হবে আপনাকে।'

'কি?'

'বডিগার্ড সবাইকে এখান থেকেই বিদেয় করে দিতে চেয়েছিলেন আপনি। কিন্তু ওরা সঙ্গে থাকবে আমাদের ড্যানসন বীচ পর্যন্ত।'

'এতে আমার কোন আপত্তি নেই,' বলে উঠল রানা। 'সবাই থাকলে বরং মনের জোর আরও বাড়বে আমার। তবে, ড্যানসন নয়, বওমী বীচ থেকে পিক আপ করা হবে আমাদের। আমার এই নতুন সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছি আমি লোটাসকে।'

'কেন' বলতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল লেফটেন্যান্ট। 'এবারও নিশ্চই বলবেন, এরও কারণ আছে?'

'অফকোর্স। কারণ ছাড়া কেন করতে যাব আমি এসব?'

এফ. বি. ওসমানীর আফটার ডেক থেকে এক এক করে তিনটে বড় আকারের স্পীডবোট পানিতে নামানো হলো কপিকলের সাহায্যে। পিছনে এনজিন জুড়ে তৈরি করতে আধ ঘণ্টার মত সময় ব্যয় হলো। যুদ্ধের সাজে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ষোলোজন নির্ভীক কমান্ডো উঠে পড়ল ওগুলোয় ভাগ ভাগ হয়ে।

ঠিক চারটের সময় নির্দেশ দিল মেজর আনোয়ার, 'লাইটনিং, গো!'

মৃদু গর্জন করে চালু হলো মোটরগুলো। মন্থর গতিতে উপকূলের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল তিনটে স্পীডবোট।

ওদিকে থারাওয়াদ্দি পৌঁছেই সিদ্ধান্ত পাল্টিয়েছে কর্নেল মঙ। সারারাত ধরে নির্বিবাদে এগোতে থাকবে শত্রু, ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ হচ্ছে না তার। রানারা যখন ইরাবতি পেরিয়ে পশ্চিমমুখো হাইওয়েতে উঠেছে, সেই সময় থারাওয়াদ্দির সামরিক এয়ারস্ট্রীপ থেকে আকাশে উঠল দুটো প্রকাণ্ড হেলিকপ্টার। একটায় রয়েছে বিশজন কমান্ডো, মেজর নিয়ন্ট-এর নেতৃত্বে।

অন্যটায় সে নিজে এবং আরও জনাদশেক কমান্ডো।

সারারাত ধরে অনুসরণ করবে সে গাড়ি দুটোকে। দূর থেকে। প্রয়োজনে কাছাকাছি কোন সামরিক হেলিপ্যাডে নেমে রিফুয়েলিঙ সেরে আবার উঠবে আকাশে। ইচ্ছে করলে রাতের অন্ধকারেই হামলা চালাতে পারে সে, কিন্তু তাতে চিতার পালিয়ে যাওয়ার ভয় আছে। কিছু টের পেয়ে যদি পথের মাঝে গাড়ি ফেলে গা ঢাকা দেয়, তাহলে আর কোনদিন ধরা যাবে না ব্যাটাকে। ব্যর্থ হয়ে যাবে এত পরিশ্রম।

তীরবেগে ছুটছে প্রায় নতুন মিটসুবিশি ট্রাক। চালাচ্ছে আবদুর রহমান। মাসুদ রানা তার পাশে বসেছে। মেজর জেনারেল সহ অন্যরা সবাই পিছনে। সমুদ্র তীরের কাছাকাছি ছোট ছোট শহর ও পর্যটন কেন্দ্রগুলোয় যাওয়ার রাস্তা এই একটাই। মোটামুটি ভালই রাস্তা, খুব একটা ঝাঁকি লাগছে না।

জীপটাকে অন্য পথে আকিয়াবের দিকে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল রানা। কিন্তু বাদ সাধল এই রাস্তা। ওদিকে যাওয়ার অন্য যে পথটা আছে, সেটায় উঠতে হলে একেবারে থারাওয়াদ্দি শহরের বুকের ওপর দিয়ে অন্তত ছ সাত মাইল চলতে হবে। আবার তা করতে গেলে মঙের কয়েক ডজন চরের চোখে পড়ে যেত জীপটা।

তাহলে সাথে সাথে খবর পেয়ে যেত মঙ যে গাড়ি খালি, শুধু চালক ছাড়া আর কেউ নেই ওটায়। তখন নিশ্চয়ই এই ট্রাকের পিছনে লাগত সে। ও নিশ্চয়ই জানে, জীপই শুধু নয়, একটা ট্রাকও আছে ওদের সাথে। আগে এটার কথা জানা না থাকলেও বিকেলে জেনেছে কর্নেল ব্যাপারটা, রাশেদ যখন জঙ্গল ছেড়ে রওনা হয় পোড়ো মন্দিরের উদ্দেশে। তাই বাধ্য হয়েই জীপটাকে সঙ্গে আনতে হয়েছে ওকে। ট্রাকের চার-পাঁচ মাইল পিছন পিছন আসছে ওটা। ভোর চার কি সাড়ে চারটের সময় বাঁক নিয়ে ডানে ঘুরে যাবে ল্যান্ড রোভার, আকিয়াব যাওয়ার বিকল্প পথ ওটা। তখন খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। ওটার চালক, কায়েসকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছে রানা, ওই রাস্তায় উঠে বেশ কিছুদূর এগিয়েই গাড়ি থামাতে হবে, পিছনের মাডগার্ড থেকে খুলে ফেলতে হবে ডিভাইসটা। তারপর জানপ্রাণ নিয়ে ভাগতে হবে।

সকালে এই যুবকই ওই চার ইনফরমারের খোঁজ নিয়ে এসেছিল। মেজর জেনারেল ইবরাহিম আগেই সব ঝামেলা মিটিয়ে দিয়েছেন রানার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তুলতে বারণ করে। কাজেই ইচ্ছে থাকলেও জিজ্ঞেস করতে পারেনি রাশেদ, কেন এসব করছে ও।

নদী পার হওয়ার সময় ঝামেলার আশঙ্কা করেছিল রানা। সতর্কও ছিল। কিন্তু ঘটেনি কিছুই। নিরাপদেই ইরাবতি পার হয়ে এসেছে। তাই বলে উদ্বেগ মোটেই কমেনি রানার। ছিলার মত টানটান হয়ে আছে, সতর্ক নজর রেখেছে সবদিকে। বিপদ যদি আসেই, আগেভাগে তা টের পেতে চায়।

বাজুকাটা নিজের কাছে রেখেছে রানা, ওর পায়ের কাছে ভাল-মানুষের ছা'র মত শুয়ে আছে ওটা। এছাড়া আছে একটা স্টেন আর তিনটে গ্রেনেড।

মাঝেমধ্যে এক আধটা মালবাহী ট্রাক দেখা যাচ্ছে, তীব্র হর্ন বাজিয়ে সাঁ করে পাশ কাটিয়ে ছুটে যাচ্ছে উল্টোদিকে।

কাছের একটা হেলিপ্যাড থেকে এইমাত্র রিফুয়েলিঙ সেরে আকাশে উঠেছে কর্নেল। একটু একটু করে দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। এই সময় ব্যাপারটা চোখে পড়ল তার। চলতে চলতে আচমকা ডানে বাঁক নিয়েছে ল্যান্ড রোভারটা। অথচ ওটার আগের ট্রাকটা সোজাই ছুটছে। যদিও তিন-চার মাইল আগে রয়েছে ওটা, কিন্তু অনেক উঁচুতে রয়েছে কর্নেলের কপ্টার, ফলে দুটোকেই দেখতে পাচ্ছে সে।

মনে মনে নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'ব্যাপারটা কি?'

পাইলটের কাঁধে টোকা দিয়ে জীপটা দেখাল সে। 'ওটার সামনে চলো,' বলেই মেজর নিয়ন্টের সাথে কথা বলতে শুরু করল ব্যস্ত হয়ে।

ততক্ষণে জীপটার মাথার ওপর পৌঁছে গেছে তার প্রকাণ্ড কপ্টার, দ্রুত নিচে নামছে এখন।

'সামনে গিয়ে রাস্তার ওপর ল্যান্ড করবে,' পাইলটের উদ্দেশে বলল কর্নেল। 'ওটার এগোবার পথ বন্ধ করে দিতে হবে। পারবে না?'

রাস্তার দু দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে গাছপালাহীন ফাঁকা একটা জায়গা খুঁজে পেল সে। কপ্টারের নাক সেদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বলল লোকটা, 'পারব, কর্নেল।'

পাশ থেকে বিনকিউলারটা তুলে নিয়ে চোখে লাগাল কর্নেল। দ্রুত ফরসা হয়ে আসছে চারদিক। গাড়ির ভেতরটা কেমন ফাঁকা মনে হচ্ছে যেন—যদিও পুরোপুরি নিশ্চিত নয় সে এখনও। মেজরের সাথে কথা বলল আবার মঙ, তাকে গাড়িটার পিছনে, যতটা সম্ভব নিচে নেমে আসার নির্দেশ দিল।

বিপদ টের পেয়ে গেছে কায়েস। সামনেই কর্নেল মঙের দানবীয় কপ্টারটাকে ল্যান্ড করার তোড়জোড় করতে দেখে চট্ করে এক্সিলারেটরের ওপর পায়ের চাপ কমিয়ে দিল সে। কিন্তু ল্যান্ড করল না ওটা, একেবারে সামনে থেকে ভেতরটা দেখে নিয়ে যখন নিশ্চিত হলো কর্নেল যে আর কেউ নেই ল্যান্ড রোভারে, পিছন থেকে নজর বুলিয়ে মেজরও যখন ওই একই মত পোষণ করল, সাঁ করে আবার আকাশে উঠে পড়ল কপ্টারটা।

'হারামজাদাকে শেষ করে রেখে এসো,' মেজরকে হুকুম দিল কর্নেল, রেগে ভোম হয়ে গেছে। 'আমি যাচ্ছি ওই ট্রাক ধরতে, তাড়াতাড়ি এসো।'

কাত হয়ে দ্রুত উঠে যেতে লাগল কপ্টারটা, তারপর নাক ঘুরিয়ে নিয়ে পশ্চিমদিকে ছুটল আড়াআড়িভাবে।

ল্যান্ড রোভারের মাথার ওপর দিয়ে সামনে চলে এল মেজর নিয়ন্ট। পিছনদিকের একটা টানা দরজা খুলে গেল ভেতর থেকে এক হ্যাঁচকা টান খেয়ে। দেখতে পেল কায়েস, দরজা গলে বেরিয়ে এল একটা হেভি মেশিনগানের নল, অ্যামুনিশন বেল্টটাও পরিষ্কার চোখে পড়ল।

গতি কমে গেছে অনেক, প্রাণপণে ব্রেক কষল সে। এরই মাঝে দেখতে

পেল, উল্টোদিক থেকে দু তিনটে মাল বোঝাই ট্রাক এদিকেই আসছিল, সামনের ব্যাপার দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে তারা। কড়া ব্রেকের ফলে প্রায় জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল ল্যান্ড রোভার, সেই সাথে ঘুরে গেছে পিছনদিকটা। এতে সুবিধেই হলো কায়েসের, পাশ থেকে স্টেনটা খাবলা মেরে তুলে নিয়েই দরজা খুলে ঝাঁপ দিল সে অন্যদিক দিয়ে। গাড়িটাই ওকে আড়াল করে রেখেছে এখন।

বাঁ কনুই আর কাঁধ দিয়ে পাকা রাস্তায় আছড়ে পড়ল কায়েস, প্রচণ্ড ঘষা লেগে ছাল-চামড়া উঠে গেল কয়েক জায়গার। খোলা প্রান্তর কেঁপে উঠল হেভি মেশিনগানের গুম গুম গুম গুম একটানা আওয়াজে। একটা গুলিও সম্ভবত মিস্ করেনি গানার, ল্যান্ড রোভারের ওপাশটা ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

আওয়াজ পাল্টে গেছে কন্টারের, ঘুরে এপাশে আসছে ওটা বোঝা গেল। ক্রল করে গাড়ির সামনে চলে এল কায়েস, চট করে একবার মাথা তুলেই নামিয়ে নিয়েছে। ওরই মাঝে চোখে পড়েছে, পিছন দিক থেকে গাড়ির বিশ-ত্রিশ গজের মধ্যে চলে এসেছে দানবীয় কন্টার। রোটর ব্লেডের কর্কশ কট্ কট্ কট্ কট্ আওয়াজে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়, ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে চারদিক। পথের দুপাশের শস্যখেত শুয়ে পড়ছে কাত হয়ে প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাসে।

আবার হুঙ্কার ছাড়ল মেশিনগান। সাবধানে ঘুরে অন্যপাশে চলে এল কায়েস, ছিন্নভিন্ন গাড়ির দেয়ালের গায়ে পিঠ ঘষে ঘষে পিছনে এসে দাঁড়াল। ঘামছে দরদর করে। মেশিনগানের আরেকবার বিরতির অপেক্ষায় আছে। জানে, এ খেলা বেশিক্ষণ চলবে না, এখনই হয়তো গ্রেনেড চার্জ করবে ওরা। এ ও বুঝে নিয়েছে, আর বড়জোর কয়েক সেকেন্ড আছে তার আয়ু। কাজেই যা করার প্রথম সুযোগেই করতে হবে।

থেমে গেল মেশিনগান। গলা টান করে ওকে খুঁজছে গানার। তার পাশে আরেকজনকে দেখতে পেল কায়েস, হাঁটু গেড়ে বসে গ্রেনেডের পিন খুলছে। খুলে ফেলেছে। ঝট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল কায়েস—প্রচণ্ড বাতাসে মাথার সাথে চুলগুলো লেপ্টে গেছে, শার্ট-প্যান্ট সেঁটে আছে দেহের সাথে।

রোটরের আওয়াজে প্রায় চাপা পড়ে গেল কায়েসের স্টেনের গর্জন। একই মুহূর্তে গ্রেনেডটা ছুঁড়ে দিল দ্বিতীয় কমান্ডো। পরপর তিনটে বুলেট ঢুকল তার বুকে, ঝাঁকি লেগে হাতটা কেঁপে গেল তার। গাড়ির সামনের দিকে ছুঁড়তে চেয়েছিল সে ভয়ঙ্কর ডিমটা, কিন্তু হাত কেঁপে যাওয়ায় অতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে পারল না ওটা। ঠাস্ করে আছড়ে পড়ল ঠিক কায়েসের দু পায়ের ফাঁকে। লাফিয়ে সরে গেল কায়েস, গড়িয়ে বেশ অনেকদূর চলে গেল গ্রেনেড, তারপর ফাটল নিরাপদ দূরত্বে। আবার ট্রিগার টানল কায়েস। একটা গুলি ঢুকে গেল গানারের ডান চোখের মধ্যে। সামনে ঝুঁকে এল গানার, দেহটা বেরিয়ে আসছে খোলা দরজা দিয়ে। এই সময় সামনের দরজা খুলে গেল ঝট্ করে, পা দিয়ে ওটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে মেজর নিয়ন্ট, যাতে বাতাসে বন্ধ হয়ে যেতে না পারে। আগেই নিজের পিস্তলটা বের করে নিয়েছে। কায়েসকে

লক্ষ্য করে পুরো ম্যাগাজিন শেষ করে ফেলল সে। ছিটকে পড়ল কায়েস, একটা বুলেট লেগেছে বুকে, আরেকটা তলপেটে। পড়ে গেল মাটিতে। একই সাথে গানারের দেহটাও ধড়াস্ করে আছড়ে পড়ল এসে তার পাশে। নিষ্পলক, প্রাণহীন চোখে একে অন্যের দিকে চেয়ে আছে ওরা দুজন। নিচের দৃশ্যটা ঝুঁকে পড়ে দেখল কিছুক্ষণ নিয়ন্ট, তারপর টেনে বন্ধ করে দিল দরজা। তার ইঙ্গিতে ঘুরে গেল কপ্টার। পিছনদিকে তাকাল মেজর। নিহত কমান্ডোকে চারপাশ থেকে ঘিরে বসে আছে অন্যরা। স্লাইডিং ডোর বন্ধ করার নির্দেশ দিল সে।

ওদিকে অনেক দূর থেকে কোনাকুনিভাবে ছুটে আসা কালচে বিভীষিকাটা চোখে পড়ল রানার হঠাৎ করেই। প্রায় একই সাথে রহমানও ওটাকে দেখতে পেয়েছে। তবে খুব একটা প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না তার মধ্যে, কেবল গাড়ির গতি আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিল।

ঘুরে বসে ক্যাবের কাঁচের পার্টিশনের গায়ে ধুম ধুম করে কয়েকটা কিল লাগাল রানা। ছুটে এল রাশেদ আর গোরা। ইশারায় কপ্টারটা দেখাল ও তাদের। দরজা খুলে পিছন ফিরে চেঁচিয়ে বলল, 'গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লে নেমে পড়বেন সবাই, রাস্তার পাশে শেল্টার নেবেন।'

দেখতে দেখতে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল ওটা। ঘুরে সামনে চলে গেল।

পায়ের কাছ থেকে বাজুকা তুলে নিল রানা। মনে মনে এ ধরনের কিছু একটা আশঙ্কা করছিল ও সারারাত ধরেই। বুঝে নিয়েছিল, রাতের চেয়ে দিনের আলোকেই বেছে নেবে কর্নেল হামলা চালাবার জন্যে। ওটাই তার জন্যে সুবিধেজনক হবে। সামনে তাকাল রানা। দূরে চলে গিয়েছিল কপ্টারটা, ফিরে আসছে আবার। অনেকটা নিচে নেমে এসেছে। ওটার আকার দেখে কিছুটা বিস্মিত হলো সে।

তার মানে কি সঙ্গে করেই সৈন্য সামন্ত নিয়ে এসেছে কর্নেল? এরা ছাড়া সামনে আর কোন রোড ব্লক নেই? সামনে সোজা রাস্তা, দু পাশের শস্যখেত থেকে বেশ খানিকটা উঁচু। রাস্তার দু পাশে তেমন বড় কোন গাছপালাও নেই। কারণটা একটু লক্ষ করতেই বুঝল রানা। প্রায় নতুন রাস্তা এটা। দু পাশে ছোট ছোট গাছ দেখা যাচ্ছে, পাঁচ ছ ফুটের বেশি লম্বা হবে না কোনটা।

ঝপ্ করে অনেক নেমে এল কপ্টার। ভাব দেখে মনে হলো যেন ল্যান্ড করতে যাচ্ছে রাস্তার ওপরই। ব্যস্ত হয়ে ডানে-বাঁয়ে চাইল রানা। এমন এক জায়গা এটা, গাড়ি ছেড়ে কোথাও যে গা ঢাকা দেবে, উপায় নেই তার। দুদিকে ফসলের খেত, একদম খোলামেলা। সবাইকে শেয়ালের মত তাড়া করেই ধরতে পারবে কর্নেল মঙ।

এই সময় বাইরের বড় রিয়ার ভিউ মিররে পলকের জন্যে আরেকটা কপ্টারের ছায়া পড়ল। আঁতকে উঠল রানা। সর্বনাশ! ডান হাতে রহমানের একটা হাত চেপে ধরল ও, ইশারায় গাড়ি থামাতে বলল লোকটাকে। সামনের কপ্টার ততক্ষণে সত্যি সত্যি পথের ওপর নেমে পড়ার আয়োজন সম্পন্ন করেছে। দরজা খুলে একলাফে বেরিয়ে এল রানা। পিছন থেকে

অন্যরাও ঝপাঝপ্ লাফিয়ে পড়ল রাস্তায়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাস্তার দু পাশে নেমে গিয়ে শুয়ে পড়ল ঢালের ওপর।

ট্রাকের বড়জোর একশো গজ সামনে ল্যান্ড করল প্রথম দৈত্যাকার কপ্টারটা। দু পাশের স্লাইডিং দরজা খুলে নেমে পড়ল আট দশজন কমান্ডো, অস্ত্র বাগিয়ে একলাফে ঢাল বেয়ে নেমে গেল তারা, মুহূর্তে চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল। ওটার সামনের দরজা খুলে গেল, ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল কর্নেল মঙ। শুয়ে পড়ল সে রাস্তার ওপর। তার চারপাশে ধুলোর ঝড় বেয়ে যাচ্ছে। তবে রোটরের আওয়াজ কমে আসছে এখন, এনজিন অফ করে নেমে পড়েছে পাইলটও।

ট্রাকের পিছনে এসে বসে পড়ল রানা। রাশেদকে বলল, 'আপনি আপনার লোকদের নিয়ে সামনের ওদের ঠেকান। আমি এদিক দেখছি। কপ্টারের গায়ে গুলি করে না যেন কেউ।'

মুখের সামনে মেগাফোন ধরে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল কর্নেল মঙ, 'সারেন্ডার! সারেন্ডার! মেজর জেনারেল, সারেন্ডার করুন। তাহলে কারও কোন ক্ষতি করা হবে না। খবরদার, কেউ পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি করার নির্দেশ দেব আমি,' বার বার একই কথা বলে চলেছে সে।

রাস্তার বাঁ দিকে উঁকি দিল রানা। মেজর জেনারেল আর জিনিয়াকে নিজেদের দেহ দিয়ে আড়াল করে রেখেছে তার পাঁচ ছ'জন বডিগার্ড। গোরা আর জসিম রয়েছে ওদের সামান্য এপাশে। দু'জনের হাতে দুটো স্টেন। রানার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে ওরা। পিছনের কপ্টার এর মধ্যে অনেক নেমে এসেছে, আর দু মিনিটের মধ্যে ল্যান্ড করবে।

চোখের সামনে ওটার মস্ত পেট দেখতে পাচ্ছে রানা, নাক ওপরদিকে করে নেমে আসছে একটু একটু করে। যখন মনে হলো সময় হয়েছে, ঝট্ করে সিধে হলো, বাজুকা কাঁধে ঠেকিয়েই টেনে দিল ট্রিগার। প্রচণ্ড 'গুড়ুম' শব্দে তালা লেগে গেল কানে।

ঠিক মেজর নিয়ন্ট আর পাইলটের পায়ের কাছে, সামান্য নিচে আঘাত করল গোলাটা, প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল প্রকাণ্ড গঙ্গাফড়িং। ফ্লোর ভেদ করে ক্যাবের ট্র্যান্সপ্যারেন্ট আবরণ গুঁড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল গোলা। নাক নিচু করে সাঁ করে মাটির দিকে নেমে আসতে লাগল কপ্টার গোঁত্তা খাওয়া ঘুড়ির মত।

বাজুকা রি-লোড করে আবার ট্রিগার টানল রানা, দু সেকেন্ডও পার হয়নি, দ্বিতীয় গোলার আঘাতে মাঝখান থেকে প্রায় দুভাগ হয়ে গেল কপ্টার। ভেতর থেকে ছিটকে শূন্যে বেরিয়ে এল বড়সড় পুতুল আকারের কয়েকজন সুসজ্জিত সৈনিক, বাতাসে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সবেগে নেমে আসছে।

পরমুহূর্তে প্রথম কপ্টারের কমান্ডোরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করল অন্ধের মত। কর্নেল মঙ টের পেয়ে গেছে, সারেন্ডার করার ইচ্ছে নেই চিতার। প্রথম মর্টারটা ফোটার আওয়াজে ঘাবড়ে গেল সে, মেগাফোন ছুঁড়ে ফেলে দুই গড়ান দিয়ে রাস্তা থেকে নেমে পড়ল।

এই সময় ভয়ানক জোরে কেঁপে উঠল মাটি, সেই সাথে প্রচণ্ড কড়কড় মড়মড় আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠল চারদিক। পথের ওপরই আছড়ে পড়েছে কপ্টার। হালকা একটা বিস্ফোরণের শব্দ উঠল, পরমুহূর্তে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল ওটা। পেট্রোল ট্যাঙ্ক বার্স্ট করেছে। অসংখ্য আগুনের শিখা চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল দলা পাকানো লোহার স্তূপটাকে।

ওদিকে দুপক্ষ তখন মেতে উঠেছে তুমুল যুদ্ধে। একটা কপ্টারকে ভূপাতিত হতে দেখে মনোবল বহুগুণ বেড়ে গেছে রোহিঙ্গাদের। অবশ্য বেশি গুলি ছোঁড়া যাবে না, অ্যামুনিশন বেশি নেই, জানে ওরা। তাই একটা দুটো গুলি ছুঁড়েই চুপ মেরে যাচ্ছে, তার একশোটা জবাব দিচ্ছে কমান্ডোরা। পুরো একটা রণক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে জায়গাটা। এর মধ্যে চারদিক আরও ফরসা হয়ে এসেছে, যদিও সূর্য উঠতে দেরি আছে এখনও।

এই সময় ব্যাপারটা খেয়াল হলো রানার। মনে হলো, একটু আগে কর্নেল মঙকে রাস্তার পাশে গড়িয়ে নেমে যেতে দেখেছে ও। যেদিকে সে নেমেছে, সেদিকে বড়জোর দুজন কমান্ডো রয়েছে। অন্যরা সবাই রাস্তার ওপাশে। দেহমনে আনন্দের একটা শিহরণ বয়ে গেল ওর। ক্রল করে গোরার পাশে চলে এল তাড়াতাড়ি।

এপারেই আছে কর্নেল মঙ। কিন্তু রাস্তাটা সামনে অল্প একটু বাঁক খেয়ে গেছে বলে দেখা যাচ্ছে না ব্যাটাকে। জসিম আর গোরাকে এগিয়ে গিয়ে ওই বাঁকের মুখটার কাছে পজিশন নিতে বলল রানা। নির্দেশ দিল কর্নেল যদি উঠে পালাবার চেষ্টা করে, তাহলে ওর আশপাশ দিয়ে ফাঁকা গুলি ছুঁড়তে হবে। যে ভাবে হোক বাধা দিতে হবে তাকে, তবে গায়ে গুলি করা চলবে না। নীরবে সায় দিল ওরা দুজন। বুকে হেঁটে এগিয়ে চলল বাঁকটার দিকে।

মেজর জেনারেলের দিকে তাকাল রানা এক পলক। কিছু একটা বললেন তিনি ওকে, কিন্তু শুনতে পেল না রানা। তাঁর বডিগার্ডদের একজনের হাত থেকে একটা স্টেন নিয়ে ঢাল বেয়ে শস্য খেতে নেমে এল ও। গমের খেত এটা, প্রায় কোমর সমান লম্বা গাছগুলো।

প্রথমে খেতের অনেকখানি ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। কোমরের কাছে শরীরটাকে দু ভাঁজ করে নিয়ে দৌড়াচ্ছে। ঘুরপথে কর্নেল মঙের কাছে পৌঁছুতে চায়। দূর থেকে চট্ করে মাথা তুলে তার অবস্থানটা একবার দেখে নিল। সাথে সাথে দাঁত বেরিয়ে পড়ল রানার। আছে! ঢালের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে আছে ব্যাটা, ভয় পেয়েছে।

পিছন থেকে ওদের পঞ্চাশ গজের মধ্যে থামল রানা। আগে ওর সঙ্গের দুই হারামজাদাকে শেষ করতে হবে। উঁকি দিল ও সাবধানে। এত সৌভাগ্য, ঠিক যেন বিশ্বাস হতে চায় না, এর চেয়ে সহজ টার্গেট আর হতেই পারে না। দেয়ালের গায়ে বড় দুটো টিকটিকি যেন ঝুলে আছে। মাঝে মধ্যে গুলি ছুঁড়ছে, আবার মাথা নামিয়ে নিচ্ছে।

খুব সাবধানে একজনের কানের নিচে লক্ষ্যস্থির করল রানা। আলতো করে টেনে দিল ট্রিগার, ওদিকের গোলাগুলির আওয়াজের সাথে মিলেমিশে

এক হয়ে গেল শব্দটা। শুয়েই থাকল কমান্ডো খানিকক্ষণ, তারপর পিছলে নেমে এল দেহটা মাঠে। কর্নেল মঙের আঁতকে ওঠা পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। টুপ্ করে বসে পড়ল গম গাছের মধ্যে।

কয়েক সেকেন্ড পর আবার মাথা তুলল। ওরা বুঝতেই পারেনি গুলিটা কোনদিক থেকে এসেছে। ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখার দরকারও বোধ করছে না হয়তো, নিজেদের জান নিয়েই ব্যস্ত। ধীরেসুস্থে পরেরজনের কলজে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করল রানা নিখুঁতভাবে। এইবার ধড়মড় করে উঠে বসল কর্নেল, উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় দিতে গেল রাস্তার ওপারে যাওয়ার জন্যে, এই সময় বাঁকের কাছ থেকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল গোরা আর জসিম।

আশপাশ দিয়ে ভ্রমরের মত বোঁ বোঁ করতে করতে ছুটে যাচ্ছে অসংখ্য গুলি। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল মঙ, হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল আবার মাটিতে বুক দিয়ে—ঠিক নিজের থেকে নয়, পা হড়কে যাওয়ায় আপনাআপনিই পড়ে গেল জলহস্তী। সেই সাথে শেষ ভরসা হাতে ধরা অস্ত্রটাও ছুটে গেছে।

এরমধ্যে বুকে হেঁটে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে রানা। কর্নেল যখন অস্ত্রটা খুঁজে বের করতে ব্যস্ত, সেই সময় তার পাঁচ হাতের মধ্যে পৌঁছে গেছে ও। এবার ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল। স্টেন বাগিয়ে ধরে আছে লোকটার পেট লক্ষ্য করে।

'গুড মর্নিং, কর্নেল।'

আঁতকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। প্রকাণ্ড মুখটা ঘামে ভিজে সপসপে হয়ে আছে, বেকুবের মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকল সে রানার মুখের দিকে।

'আপনার লোকদের গুলি বন্ধ করার অর্ডার দিন,' এক পা এগোল ও।

'আ-আপনি কে?' কোনরকমে উচ্চারণ করল কর্নেল কাঁপা গলায়।

'আনুষ্ঠানিক পরিচয় পর্ব পরে সারা যাবে, আগে যা বলছি, তাই করুন,' তার পেটের সাথে স্টেনের নল ঠেকিয়ে জোরে একটা গুঁতো মারল রানা।

সভয়ে চোখ বুজল কর্নেল। ভাঙা, বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'সিজ ফায়ার! সিজ ফায়ার! গোলাগুলি বন্ধ করো তোমরা। আমি কর্নেল মঙ বলছি, সিজ ফায়ার!'

প্রথমে একটু দ্বিধায় পড়ে গেল কমান্ডোরা। কিন্তু যখন বুঝল ওটা সত্যিই কর্নেলের গলা, তখন গুলি বন্ধ করল। ওদিকে বাঁকের মুখে বসা গোরা-জসিম দূর থেকে কর্নেলকে আটক করার ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছে। হৈ হৈ করতে করতে রাস্তার ওপর উঠে এল তারা।

কর্নেলকে ঠেলে গুঁতিয়ে রাস্তায় তুলে আনল রানা। বলল, 'আপনার লোকদের বলুন, আর্মস সারেন্ডার করতে। একটা পিনও যেন খুঁজে না পাই কারও পকেটে।'

সাথে সাথে নির্দেশ পালন করল মঙ। হাতের অস্ত্র, গোলাবারুদ মায় হেলমেটটা পর্যন্ত খুলে সাজিয়ে রাখল তারা কর্নেলের হুকুমে। তারপর পিছিয়ে গেল বিশহাত। চিতাকে মাঝখানে নিয়ে হাসিমুখে এগিয়ে আসছে রোহিঙ্গারা,

মার্চের ভঙ্গিতে। পিছন পিছন আসছে জিনিয়া, গোরা আর জসিম।

সবাইকে সশরীরে দেখতে পেয়ে মনে মনে হাসল রানা। ঘড়ির ওপর চোখ বোলাল। ভালই যুদ্ধ হলো, ভাবল ও, মাত্র ছয় মিনিটে মামলা ডিসমিস। সামান্য আহত পর্যন্ত হয়নি কেউ।

'আপনার পাইলটকে ডাকুন,' বলল রানা।

'কেন?'

'ফের কথা বলে!' দাবড়ি লাগাল রানা।

এত মানুষের সামনে বেইজ্জত হতে হচ্ছে বলে কান গরম হয়ে উঠল কর্নেলের, কমান্ডোদের দিকে ফিরে কি যেন বলল সে। তাদের ভেতর থেকেই বেরিয়ে এল একজন, ভয়ে ভয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

'রাশেদ!'

'ইয়েস, মেজর।' হাসি আর ধরে না লেফটেন্যান্টের। সামনে এসে খটাশ্ করে স্যালুট ঠুকল রানাকে।

হেসে ফেলল ও। বলল, 'ওদের আর্মসগুলো ট্রাকে তুলুন। এখনই রওনা হব আমরা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে মেজর জেনারেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিন, কুইক!'

'সে কি, আমরা যাব না?'

'দরকার নেই। এই কন্টার নিয়ে যাচ্ছি আমরা। আপনারা ফিরে যান।'

'কিন্তু···'

'ভাববেন না, সিকিউরিটি হিসেবে কর্নেলকেও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি আমরা। আমাদের টেরিটোরিতে নিয়ে কাপড়-চোপড় খুলে ছেড়ে দেব।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাশেদের চেহারা। মাথা দোলাল সে, 'সেই ভাল। কন্টারে খুব তাড়াতাড়ি হবে।'

ঘুরে দাঁড়াল। তাড়াহুড়ো করে কমান্ডোদের সমর্পণ করা অস্ত্রগুলো তুলে ফেলা হলো ট্রাকে। জাহেদকে তুলে দেয়া হলো কন্টারে। এখন অনেকটা সুস্থ বোধ করছে সে। কর্নেলকে আটক করা হয়েছে শুনে খুশি।

অশ্রুভেজা চোখে তাদের প্রিয় চিতাকে বিদায় জানাল রোহিঙ্গারা। পানি এসে গেছে তাঁর চোখেও। সবার উদ্দেশে বললেন, 'বাংলাদেশে যাচ্ছি বলে ভেব না, ওখানেই থেকে যাব আমি। খুব শিগ্‌গিরই আবার তোমাদের মাঝে ফিরে আসব। ও দেশে যাচ্ছি, তার বিশেষ কারণ আছে। ওখানে পৌঁছে দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের সামনে এদেশের সরকারের মুখোশ খুলে দিতে চাই আমি। পৃথিবীকে জানাতে চাই স্বৈরাচারী কমিউনিস্ট সরকার কি ভাবে তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছে আমাদের এই সোনার দেশটাকে।

'তোমরা লড়ে যাও। জয় আমাদের হবেই।' গলা বুজে এল মেজর জেনারেলের। তাড়াতাড়ি কন্টারে উঠে পড়লেন তিনি।

জসিম, গোরা আর জিনিয়াও উঠল এবার। চার পাঁচজন রোহিঙ্গা চ্যাঙদোলা করে কন্টারে তুলে দিল জলহস্তীকে। পাইলটকে ঠেলে তার সীটে তুলে দিল রানা। কড়া গলায় তাকে হুঁশিয়ার করল। 'প্রাণে বাঁচতে চাইলে

অক্ষরে অক্ষরে আমার নির্দেশ মেনে চলবে। তাহলে আজ না হোক কাল বাড়ি ফিরে বৌ-বাচ্চার মুখ দেখতে পাবে। ওকে?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল পাইলট। 'শিওর, স্যার।'

পাঁচ মিনিট পর আকাশে উঠল হেলিকপ্টার। নিচ থেকে মাথার ওপর হাত তুলে দোলাচ্ছে সবাই। ক্রমে ছোট হয়ে এল কাঠামোগুলো। ওদিকে দ্বিতীয় কপ্টারের আগুন প্রায় নিভে এসেছে। একটু একটু করে রাঙা হয়ে উঠছে পুবের আকাশ।

বারো

মাত্র কুড়ি মিনিটে বওমি বীচ পৌঁছল ওরা। সূর্য উঠি উঠি করেও দ্বিধায় পড়ে গেছে মেঘের জন্যে। হঠাৎ করে মেঘ জমতে শুরু করেছে, বৃষ্টি নামবে যে কোন সময়।

এককালে জমজমাট পর্যটন কেন্দ্র ছিল বওমি, তার কিছু কিছু চিহ্ন এখনও আছে। ব্রিটিশ আমলের ছিল বলে সুযোগ-সুবিধে তেমন ছিল না। পুরানো হোটেল-মোটেল, মার্কেট ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় চারদিকে। এখন স্রেফ একটা জেলে পল্লী এটা। দেশী-বিদেশী পর্যটকদের চাহিদার কথা ভেবে কয়েকবছর আগে কিছু দূরে, ড্যানসন বীচে সরিয়ে নেয়া হয়েছে পর্যটন কেন্দ্র। ওখানে সব আধুনিক ব্যবস্থা।

একটু দূরে এক জেলে পল্লী চোখে পড়ল রানার। জীর্ণ, ভাঙাচোরা কুটির। বাঁশের আড়ায় শুকোতে দেয়া জাল, শুঁটকি মাছ দেখা যাচ্ছে। কপ্টারের আওয়াজ শুনে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল একদল হাড় জিরজিরে ছেলেমেয়ে। বড়রাও বেরিয়ে এল। কপ্টার দেখে শিশুরা হাত নাড়তে লাগল প্রবলবেগে।

চোখ কুঁচকে সামনে, ডানে-বাঁয়ে নজর বোলাল মাসুদ রানা। চিন্তায় পড়ে গেল। ওরা কি আসেনি? নাকি এসেছে, গা ঢাকা দিয়ে আছে আশপাশে? তাই হবে। ওদের কপ্টারে আসার কথা ছিল না, ছিল সড়কপথে। ঠিক তাই, ভাবল ও। আর্মির ছাপ মারা যন্ত্র ফড়িং দেখে ব্যাপার বোঝার জন্যে গা ঢাকা দিয়েছে কমান্ডো বাহিনী। নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বের হবে না।

হাত তুলে পাইলটকে সমুদ্রের তীরঘেঁষা একটা জায়গা দেখাল ও। 'ওখানে ল্যান্ড করো।'

মাথা ঝাঁকাল সে। ঘাড় ঘুরিয়ে কর্নেল মঙকে দেখল রানা। হেরে যাওয়ার লজ্জায় চেহারা হাঁড়ির তলা করে রেখেছে। নিচের ঠোঁট ঝুলে আছে বিশ্রীভাবে, ভেতরের কালো মাড়ি দেখা যাচ্ছে। ওর সাথে চোখাচোখি হতে মুখ ঘুরিয়ে নিল জলহস্তী। জিনিয়া বোধহয় ওকেই দেখছিল, হাসল সে মুখ টিপে। কৃতজ্ঞতার হাসি। হঠাৎ যেন বদলে গেল তা, অন্যরকম হয়ে উঠল।

রক্তিম আভা ফুটল দুই গালে। ব্যাপার টের পেয়ে সে-ও জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখায় ব্যস্ত হয়ে উঠল।

নেমে পড়ল কপ্টার। রানার অনুমানই ঠিক, পরিস্থিতি বোঝার জন্যে তীর থেকে খানিকটা দূরে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ছিল লাইটনিং কমান্ডো বাহিনী। ওদের দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে এল, কয়েকজন বোট দুটো টেনে নিয়ে আসছে বালির ওপর দিয়ে।

একেবারে আঁধার হয়ে এসেছে চারদিক। হঠাৎ একটু ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েই শুরু হয়ে গেল ঝমাঝম্ বৃষ্টি। আড়াল নেই, কাজেই গা বাঁচাবার চেষ্টায় ব্যস্ত হলো না কেউ, ভিজে চুপচুপে হয়ে স্পীড বোটে উঠল। মঙকে কষ্ট করে হেঁটে গিয়ে উঠতে হলো না, দু'তিনজন কমান্ডো ঠেলে-গুঁতিয়ে তুলে দিল। পাইলট মানুষটা সেয়ানা। তার দিকে কারও নজর পড়ার আগেই প্রায় দৌড়ে গিয়ে বোটে উঠল সে, ধাক্কা-গুঁতোর হাত থেকে বাঁচা গেছে ভেবে মনে মনে বুদ্ধকে ধন্যবাদ জানাল।

দলটাকে অপেক্ষা করতে বলে কপ্টারের কাছে ফিরে এল রানা। স্টেনের বাঁট দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে গুঁড়ো করে দিল ওটার প্যানেল বোর্ড। নিচ দিয়ে বেরিয়ে থাকা তারগুলো গায়ের জোরে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে এল একটা একটা করে। যখন বুঝল অন্তত এক সপ্তাহের আগে আকাশে উড়তে পারবে না ওটা, ফিরে এসে বোটে উঠল। তীরবেগে গভীর সমুদ্রের দিকে ছুটল স্পীডবোট দুটো। তখনও বৃষ্টি হচ্ছে ঝমঝম করে।

এফ.বি. ওসমানীর ডেকে দলটাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল মেজর আনোয়ারুল ইসলাম। জাহাজ ঘুরিয়ে ছুটল সে আন্তর্জাতিক জলসীমার দিকে। কিন্তু আকাশের অবস্থা খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে বলে মাইল দশেক এগিয়ে ট্রলার থামানোর নির্দেশ দিল রানা।

'এদের নামিয়ে দিয়ে যাই এখানে। পরে ঝড় উঠলে হয়তো ডুবে মরবে,' বলল ও।

'তাই করুন,' মাথা ঝাঁকাল মেজর।

ওদিকে আফটার ডেকে চুপচুপে ভেজা কর্নেল মঙকে নিয়ে হাসি ঠাট্টায় মেতে উঠেছে ওসমানীর ডেক ক্রু-রা। গোরা আর জসিমের মুখে তার কীর্তি এরমধ্যে শোনা হয়ে গেছে তাদের।

'উরি হালারে!' বলল একজন। 'কি মুডা গর্দান, এক্কেরে গাণ্ডারের মথন দ্যাহায়।'

হো হো করে হেসে উঠল সবাই। মাস্টার'স ব্রিজের পিছনদিকে ডেকের ওপর পাশাপাশি বসিয়ে রেখেছে ওরা কর্নেল আর পাইলটকে। মাথা নিচু করে বসে আছে তারা। ভাষা না বুঝলেও লোকগুলো কি নিয়ে হাসাহাসি করছে, বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হচ্ছে না। হঠাৎ ছুটে এল গোরা, দু'হাতে কর্নেলের দু পায়ের গাঁট আঁকড়ে ধরে চোখমুখ ভয়ঙ্কর করে হেঁড়ে গলায় হাঁক ছাড়ল। 'অই, ধর মগা হালারে, ফালা পানিতে!' গোরা ধরল দু'পা অন্য দুজন দুই

হাত—শূন্যে তুলে লোকটা দোলাচ্ছে ছুঁড়ে ফেলার ভঙ্গিতে।

এই সময় ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এল রানা, মেজর আনোয়ার আর মেজর জেনারেল। ভেজা কাপড় পাল্টে নিয়েছে ওরা সবাই। সামনের দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠল আনোয়ার, হাঁ হাঁ করে উঠল সে। 'অ্যাই, করো কি, করো কি!'

লজ্জা পেয়েছে যেন, কর্নেলকে ছেড়ে দিয়ে এমনভাবে মাথা চুলকাতে লাগল ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

মঙের সামনে এসে দাঁড়ালেন চিতা। বললেন, 'শেষ পর্যন্ত তোমাকে ছেড়েই দিতে হচ্ছে, মঙ।'

ঝট করে চোখ তুলল কর্নেল। যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না কথাটা।

'নৌকা বাইতে জানো?'

মাথা দোলাল সে, জানে না।

'তুমি?' পাইলটের দিকে ফিরলেন তিনি।

'জানি, স্যার।'

'গুড,' রানার কাঁধে একটা হাত রাখলেন তিনি। কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই ছেলে খুব দয়ালু, বুঝলে? ওর অনুরোধেই তোমাকে ছেড়ে দিলাম আমি। নইলে, এ যাবৎ যত অপরাধ তুমি করেছ, তাতে তোমার মাংস কুচি কুচি করে কুকুর দিয়ে খাওয়ালেও আমাদের গায়ের ঝাল মিটত না।'

মাথা আবার নিচু হয়ে গেল কর্নেলের। একজনকে কাছে ডেকে চাপা গলায় কি যেন বলল মেজর আনোয়ার। মাথা ঝাঁকিয়ে ছুটে গেল লোকটা পিছন দিকে। একটু পর সে ফিরে আসতে চিতার দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল মেজর।

'উঠে দাঁড়াও, মঙ। বোট রেডি, যাও, দূর হয়ে যাও।'

বহু কষ্টে দাঁড়াল সে বিশাল ধড় নিয়ে। কয়েকজন মিলে ধরাধরি করে একটা স্পীডবোটে তুলে দিল ওদের। তবে এনজিন খুলে রাখা হয়েছে ওটার। দুজনের হাতে দুটো বৈঠা ধরিয়ে দেয়া হলো। সাথে কিছু শুকনো খাবার, পানি আর একটা পকেট কম্পাস।

মেজর আনোয়ারের দিকে ফিরল রানা। 'ওয়েদার রিপোর্ট কি বলে, ঝড়-টড় উঠবে না তো? ডুবে মরবে না তো ব্যাটারা?' চাপা গলায় জানতে চাইল।

'না। এইমাত্র ওয়েদার রিপোর্ট শুনলাম, আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় সে সম্ভাবনা নেই।'

'যাও, মঙ,' পিছন থেকে বললেন চিতা। বেশ মুড়ে আছেন মনে হলো। 'আমি আবার আসছি। এবার আমার অন্য চেহারা দেখবে তুমি, তৈরি থেকো।'

লগি দিয়ে ঠেলে বোটটাকে দূরে সরিয়ে দেয়া হলো। ঝপাঝপ বৈঠা চালাতে শুরু করল পাইলট। কিন্তু কর্নেল বসে আছে অনড়। এই সময় আরও চেপে এল বৃষ্টি, ঝাপসা হতে হতে মিলিয়ে গেল বোট এক সময়।

কাঁধে কার হাত পড়তে পিছন। [illegible] রানা। ক্যাপ্টেন জাহেদ। 'আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, রানা। জীবনের আশা তো ছেড়েই দিয়েছিলাম, তুমি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছ।'

'আমাদেরকেও।' জাহেদের বাংলা কথা না বুঝলেও, ও কি বলতে চাইছে, ঠিকই বুঝে নিয়েছেন বৃদ্ধ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এমন সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইলেন না, এগিয়ে এসে ওকে আলিঙ্গন করলেন। পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার কথা আজীবন মনে থাকবে আমার, মাই বয়।'

লজ্জায় নাক-মুখ লাল হয়ে উঠল রানার। চোখ তুলতে মেজরের ওপর চোখ পড়ল। জিনিয়া আর সে দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। ব্যর্থ হতে হতেও এত কষ্টের মিশন সফল হয়েছে, অতএব খুশিতে আটখানা হয়ে আছে আনোয়ার। চোখাচোখি হতে ঝট্ করে অ্যাটেনশন হয়ে গেল, খটাশ্ করে স্যালুট ঠুকল সে রানাকে।

তারপর একলাফে ব্রিজে গিয়ে ঢুকল। এনজিন রূমকে পূর্ণগতিতে ছোটার নির্দেশ জানিয়ে দিল, পরমুহূর্তে মনের আনন্দে ছোট ছোট তিনটে হাঁক ছাড়ল এফ. বি. ওসমানী—গঁ-ক, গঁ-ক, গঁ-আ-ক!

* * * *